উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণ
জনস্বার্থে উন্নয়ন

জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট সম্পর্কিত
সংসদীয় ককাস
PARLIAMENTARY CAUCUS
ON NATIONAL PLANNING AND BUDGET

CENTRE ON BUDGET AND POLICY
UNIVERSITY OF DHAKA

actionaid

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
Democratic Budget Movement

উন্নয়নে জনঅংশগ্রহণ
জনস্বার্থে উন্নয়ন

জন-বাজেট প্রতিবেদন: জাতীয় বাজেট ২০১৯-২০
People's Report on National Budget 2019-20

জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট সম্পর্কিত
সংসদীয় ককাস
PARLIAMENTARY CAUCUS
ON NATIONAL PLANNING AND BUDGET

CENTRE ON BUDGET AND POLICY
UNIVERSITY OF DHAKA

actionaid

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
Democratic Budget Movement

এপ্রিল ২০১৯, ঢাকা

প্রকাশনা
গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট বিষয়ক সংসদীয় ককাস
সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা
ড. প্রতিমা পাল মজুমদার
মনোয়ার মোস্তফা
ড. কাজী মারুফুল ইসলাম
আসগর আলী সাবরী
নুরুল আলম মাসুদ
এ. আর. আমান
সেকেন্দার আলী মিনা
মোসফিকুর রহমান

রচনা ও গবেষণা
শিক্ষা: মীর মোশাররফ হোসেন
স্বাস্থ্য: আমিনুর রসুল বাবুল ও জাকির হোসেন
কৃষি: নুরুল আলম মাসুদ
শ্রম ও কর্মসংস্থান: মনোয়ার মোস্তফা
জেন্ডার: চিররঞ্জন সরকার
দলিত-বান্ধব: শবনম ফেরদৌসী ও এবিএম আনিসুজ্জামান
আদিবাসী-বান্ধব: চিররঞ্জন সরকার
প্রতিবন্ধী-বান্ধব: আলবার্ট মোল্লা
মেগা প্রকল্প: আবুল কালাম আজাদ

প্রকাশনা সহযোগী: একশনএইড বাংলাদেশ

নকশা ও মুদ্রণ: অর্ক

যোগাযোগ
গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
বাড়ি # ৫৬০ (৪র্থ তলা), রোড # ০৮, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।
ই-মেইল: democratic.budget@gmail.com, ওয়েব: www.democraticbudget.org

নিঃস্বত্ত্ব
জনসচেতনতামূলক কাজে এই প্রকাশনার সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ প্রকাশকের অনুমতি ছাড়াই পুনঃমুদ্রণ বা অনুলিপি করা যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে সূত্র উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ রইলো। এই প্রকাশনার অবাণিজ্যিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

ভূমিকা

প্রতিবছর জাতীয় বাজেটের আকার যেমন বড় হচ্ছে তেমনি ব্যয়ের গুণগত মান ও বাজেট বাস্তবায়নের দক্ষতার বিষয়টি বড় সমস্যা আকারে আলোচনায় আসছে। ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পে অগ্রাধিকারভিত্তিক বিনিয়োগের ফলে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিসহ মৌলিক সেবাখাতের বাজেট আরো সংকুচিত হবে, নাকি এসব খাতে নতুন অর্থায়ন হবে সে বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে। এদিকে জেলা পরিষদসহ বিভিন্ন স্তরে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার থাকার পরও স্থানীয় সরকারে আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এখনো সীমিত কিছু প্রকল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অথচ বাজেট বিকেন্দ্রীকরণের মধ্যদিয়ে স্থানীয় সরকারের কাছে আরো বেশি কিছু দায়িত্ব অর্পণ করা গেলে জাতীয় বাজেটের গুণগত মান পাবে নিঃসন্দেহে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা বেশ এগিয়েছি। এখন আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সার্বজনীন প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৌশল নির্ধারণ এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য হ্রাসে যথাযথ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ নিশ্চিত করা। অন্যদিকে, সারা বিশ্বব্যাপী এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে, যার বাইরে আমরাও নই। তাই জাতীয় ক্ষেত্রে একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখাটা এখন সময়ের দাবি। জাতীয় বাজেটে শান্তি-সম্প্রীতি ও সমতা নিশ্চিত করার মতো বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। বরাবরের মতো প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থানসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও অন্যান্য গ্রামীণ ও নগর পরিসেবায় বাজেট বৃদ্ধি এবারো অন্যতম বাজেট এজেন্ডা হিসেবে আলোচিত।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শ্রম ও কর্মসংস্থান, নারী, দলিত, আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন বাজেটসহ জাতীয় পরিকল্পনায় অংশভাগিদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও বাজেটের বিকেন্দ্রীকরণ কাঠামো এবং এ বিষয়ে জাতীয় সংসদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালনের বিষয়গুলি বিস্তারিত পরিসরে আলোচনায় আসা দরকার। সে লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন, জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট সম্পর্কিত সংসদীয় ককাস এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অন বাজেট এন্ড পলিসি যৌথভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, পেশা ও বৈশিষ্ট্যের মানুষের অংশগ্রহণে ৫র্থ বারের মতো 'জন-বাজেট সংসদ' আয়োজন করছে।

জনবাজেট সংসদ সামনে রেখে জাতীয় বাজেটে সরকার অত্যাবশ্যকীয় সেবাখাতগুলোকে কীভাবে দেখে, জনগণের জীবনমান পরিবর্তন ও দারিদ্র্য বিমোচনে কী ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণ করছে তা নিরীক্ষা ও জনপ্রস্তাবনাসমূহ নীতি নির্ধারকদের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে খাতভিত্তিক বাজেট বিশ্লেষণসমূহ এই পুস্তিকায় তুলে ধরা হলো।

আশা করছি, প্রকাশনার বিশ্লেষণপত্র এবং প্রস্তাবনাগুলো আগামি সময়ে জনঅংশগ্রহণমূলক বাজেট প্রণয়ন ও ন্যায্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে।

সূচিপত্র

বৈষম্য কমাতে জাতীয় বাজেটে স্পষ্ট নির্দেশনা চাই	৫
শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার	৭
বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবাখাত ও জাতীয় বাজেট	৯
খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি বাজেট	১৩
জাতীয় বাজেটে শ্রম ও কর্মসংস্থান খাত	১৬
স্থানীয় সরকারমুখী ও অংশগ্রহণমূলক ‘জেন্ডার বাজেট’ চাই	২০
জাতীয় বাজেট হোক দলিতবান্ধব	২৩
পর্যালোচনা ও প্রস্তাব জাতীয় বাজেট ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন-অগ্রগমন	২৮
অংশগ্রহণমূলক প্রতিবন্ধী-বান্ধব বাজেট চাই	৩২
মেগা প্রকল্পে বিনিয়োগ ও উন্নয়ন বাজেটে ন্যায্যতার প্রশ্ন	৩৬

বৈষম্য কমাতে জাতীয় বাজেটে স্পষ্ট নির্দেশনা চাই

'অর্থনৈতিক ন্যায্যতা' সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পূর্বশর্ত। সমাজে 'অর্থনৈতিক ন্যায্যতা' প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্যমান বৈষম্য নিরসনের কার্যকর নীতি ও কর্মসূচির বাস্তবায়ন প্রয়োজন। সুবিবেচনাপ্রসূত রাজস্ব-নীতি যেমন বৈষম্যের লাগাম টেনে ধরতে পারে, তেমনি হঠকারী অগণতান্ত্রিক নীতি-কৌশল বৈষম্য বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সরকারের আয়-ব্যয়ের ধরণ তথা বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বৈশিষ্ট্যের ওপরও নির্ভর করে বৈষম্যের হ্রাস-বৃদ্ধি। বাংলাদেশের সংবিধানসহ সরকারের বিভিন্ন নীতি-পরিকল্পনায় বৈষম্য নিরসনের বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

৬% শতাংশের বেশি হারে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলছে। অপরদিকে আশঙ্কাজনক হারে আয় ও সম্পদ বন্টন বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অর্থনীতিতে আয়-বৈষম্য পরিমাপের সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পরিমাপক হলো- জিনি সহগ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) পরিচালিত 'খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬'-এ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জিনি সহগ ২০১০ সালের ছিল ০.৪৬৫; ২০১৬ সালে এটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ০.৪৮৫। যেসব দেশের 'জিনি সহগ' ০.৫ অতিক্রম করে সেসব দেশকে উন্নয়ন তত্ত্বে উচ্চ আয়-বৈষম্যের দেশ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

লেখচিত্র: জিডিপি প্রবৃদ্ধির শতকরা হার, ২০১০-২০১৭

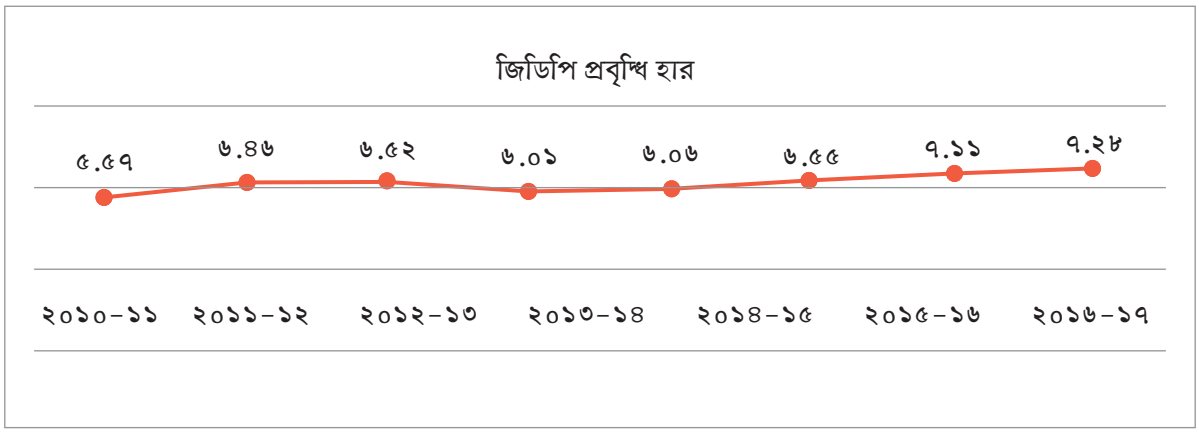

সূত্র: বাংলদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৮

সমাজে বৈষম্যের বিভিন্ন দিক রয়েছে; সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক। বয়স, জেন্ডার, এথনিসিটি, মেজরিটি-মাইনরিটি হলো সমাজ-সংস্কৃতি সৃষ্ট বৈষম্য। আয়-সম্পদের বৈষম্যের ফলে ধনী-দরিদ্রের সৃষ্টি হয়। বৈষম্যের এ উভয় দিক পরস্পরের পরিপূরক। উন্নয়ন আলোচনায় আয় ও সম্পদ বন্টন বৈষম্যের বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়। আমাদের এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

বাংলাদেশে বৈষম্যের চালচিত্র

আমাদের দেশে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার গত দুই দশক ধরে ৫% এর বেশি। বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশ বাংলাদেশ এর কাছাকাছি পৌছে গেছে। উল্লেখ্য যে, সরকারি উদ্যোগে কখনো সম্পদ বৈষম্য পরিমাপ করা হয় না। তবে কয়েক বছর আগে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)'র উদ্যোগে সম্পদ বৈষম্য পরিমাপের চেষ্টা করা হয়। সেখানে দেখা যায়, বাংলাদেশে সম্পদ বৈষম্যের ক্ষেত্রে 'জিনি সহগ' ০.৭৪। অর্থাৎ বলা যায়, সম্পদ বৈষম্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই উচ্চ বৈষম্যের স্তরে পৌছে গেছে।

সরকারের নিজস্ব পরিসংখ্যানসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদ বৈষম্যের চিত্র উঠে এসেছে। সর্বশেষ খানা আয়-ব্যয় জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, ২০১০ সালে দেশের ১০ শতাংশ উচ্চবিত্ত ধনাঢ্য ব্যক্তির দখলে মোট আয়ের ৩৫. ৮৪ শতাংশ। ২০১৬ সালে বেড়ে

দাঁড়িয়েছে ৩৮.১৬ শতাংশ। অন্যদিকে দেশের ১০ শতাংশ দরিদ্র মানুষ ২০১৬ সালে মোট আয়ের মাত্র ১.১ শতাংশের মালিক হতে পেরেছে; যেখানে ২০১০ সালে তারা মোট আয়ের ২ শতাংশের মালিক ছিল। এটাই প্রমাণ করে অল্প কিছু মানুষের হাতে যে আয় ও সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে যাচ্ছে।

২০১০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে ওপরের দিকের ৫ শতাংশ পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৮৮.১ শতাংশ; অন্যদিকে একই সময়ে নীচের দিকের ৫ শতাংশ পরিবারের আয় নেমে গেছে ৫১.৩ শতাংশ। নীচ ও ওপরের দিকের এই পার্থক্য ১২১.৩ গুন। লন্ডনভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'ওয়েল্থএক্স'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে 'অতি ধনী' লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির হার বিশ্বে সর্বোচ্চ। এ দেশে ৩ কোটি ডলার বা ২৫০ কোটি টাকার সম্পদ রয়েছে এমন মানুষের সংখ্যা বেড়েছে ১৭.৩ শতাংশ হারে।

প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার অনুপস্থিতি, সম্পদের ওপর কর ধার্য না করা এবং সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে সমস্যা সামগ্রিকভাবে বৈষম্য পরিস্থিতিকে চরম অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদের বৈষম্য দারিদ্র্য হ্রাসের হারকে ক্রমেই শ্লথ করে ফেলছে। বাংলাদেশে ২০১০ থেকে ২০১৬ মেয়াদে প্রতি বছর গড়ে ১ দশমিক ২ শতাংশ হারে দারিদ্র্য কমেছে। এর আগের পাঁচ বছর (২০০৫-১০) মেয়াদে দারিদ্র্য হ্রাসের হার ছিল প্রতি বছর ১.৭ শতাংশ।

আয় ও সম্পদ বৈষম্য কমাতে সুপারিশ

- বাজেটে প্রগতিশীল কর ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে। ধনীদের কাছ থেকে উচ্চ হারে কর আহরণ; শুধু আয় নয় সম্পদের ওপরও করারোপ করতে হবে।
- দরিদ্রদের আরও বেশি বেশি নগদ অর্থ দিতে হবে: 'ডাইরেক্ট ট্রান্সফার' বাড়াতে হবে, বিশেষ করে বয়স্ক ভাতার সংখ্যা ও পরিমাণ, পেনশন স্কিম, এবং দরিদ্র নারীদের আরও সুযোগ সুবিধা প্রদান। তাছাড়া শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিবহন ইত্যাদি খাতে বরাদ্দ/সাবসিডি দিতে হবে।
- সর্বব্যাপী ঘুষ-দুর্নীতি কমাতে হবে। এটা মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির পাশাপাশি সম্পদের বৈষম্যও সৃষ্টি করে।
- সর্বোপরি বৈষম্য কমাতে হলে 'উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান' সৃষ্টি করতে হবে। যেহেতু আমাদের অর্থনীতি বেসরকারি খাত নির্ভর, তাই বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বাড়ানো ও আপাতত: শ্রমঘন উদ্যোগে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে।

সারণী ১: খানা পর্যায়ে আয় বন্টনের শতকরা হার এবং জিনি সহগ

খানা বিন্যাস	২০০৫	২০১০	২০১৬
নীচের ৫%	০.৭৭	০.৭৮	০.২৩
নীচের ১০%	২.০০	২.০০	১.০১
ওপরের ১০%	৩৭.৬৪	৩৫.৮৪	৩৮.১৬
ওপরের ৫%	২৬.৯৩	২৪.৬১	২৭.৮৯
জিনি সহগ (আয় বন্টন)	০.৪৭	০.৪৬	০.৪৮

সূত্র: খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬

শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা দরকার

ভূমিকা

জাতীয় অগ্রগতি ও বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রমবিকাশমান জ্ঞান ও দক্ষতার সন্নিবেশ না ঘটানো গেলে কোনো ধরনের অর্জন কিংবা তা ধরে রাখা সম্ভব নয়। টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষায় পরিকল্পিত বিনিয়োগের বিষয়টি আজ সর্বজনস্বীকৃত।

শিক্ষা স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের চালিকাশক্তি– এ ভাবনাকে বিবেচনায় নিয়ে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ৪–এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য একসঙ্গে সমমানের শিক্ষা নিশ্চিত ও সবার জন্য জীবনভর শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে। এ ঘোষণার আলোকে এবং রাষ্ট্র বাংলাদেশের বিগত সময়ের অর্জন, ব্যর্থতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মানসম্মত ও একীভূত শিক্ষার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আমরা দেখেছি, এরই মধ্যে বেশ কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ২০১৭ সালের তথ্য অনুযায়ী ৯৭.৯৭ শতাংশে পৌঁছেছে; নারী শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এ হার আরও বেশি, ৯৮.২৯% ।

সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ করতে সরকার ১ম থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিনামূল্যে বই বিতরণ করছে। ব্যাপক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বৃত্তি ও উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। এ বছরই এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর খালি থাকা পদে হাজার হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিভিন্ন শ্রেণির জন্য উপকরণ হিসেবে শিক্ষা সহায়িকা প্রদান করা হচ্ছে। নতুন স্কুল ভবন নির্মাণ, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণসহ দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলে মিড–ডে মিলের প্রচলন অব্যাহত আছে। পরীক্ষাভীতি কমাতে ১ম থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা তুলে দিয়ে দৈনন্দিন উপস্থিতি ও শ্রেণিকক্ষে তৎপরতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রচলনের চিন্তা চলছে।

এখন চ্যালেঞ্জ হলো– এ অর্জনসমূহ ধরে রাখার পাশাপাশি সকল শিশুর জন্য মানসম্মত ও একীভূত শিক্ষা নিশ্চিত করা। যদিও গত কয়েক বছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে শতকরা বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে কমতে দেখা যাচ্ছে। ২০১৭–১৮ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে ৫৩ হাজার ৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ দিলেও তা মোট বাজেটের মাত্র ১১.৪১ শতাংশ। এই হার আগের দুই বছরের চেয়ে কম। আমাদের প্রত্যাশা, আগামী অর্থবছরের বাজেটে সরকার বিভিন্ন অঙ্গীকার, জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডকে বিবেচনায় নিয়ে বরাদ্দের পরিমাণ বাড়াবেন, যা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০–এর পূর্ণ বাস্তবায়নে দৃশ্যমান অগ্রগতি, মানব সক্ষমতা উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক বৈষম্য নিরসনসহ Sustainable Development Goal (SDGs)–র ৪র্থ লক্ষ্য অর্থাৎ 'Education 2030' –র নির্ধারিত ৭টি টার্গেট অর্জনে সহায়ক হবে।

জাতীয় বাজেটে শিক্ষায় বরাদ্দ – মোট বাজেট এবং জিডিপি'র তুলনায় ক্রমান্বয়ে কমছে

চলতি অর্থবছরে শিক্ষাখাতে বরাদ্দের পরিমাণ টাকার অঙ্কে বেশি দেখালেও আনুপাতিক হারে এর পরিমাণ হতাশাজনক। উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতো বটেই ভারত–পাকিস্তান, নেপালের মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোও জিডিপির যত অংশ শিক্ষায় ব্যয় করে, বাংলাদেশ তার চেয়েও অনেক কম করে।

বাজেট বক্তৃতায় অর্থমন্ত্রী প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার ও ছাত্র–শিক্ষক অনুপাত কমিয়ে আনার সফলতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। উপবৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের চেয়ে ৫০ লক্ষ বাড়ানোর কথাও জানিয়েছেন। প্রায় দেড় হাজার গ্রামে নতুন স্কুল নির্মাণ এবং ২৬ হাজার বেসরকারি স্কুলকে সরকারি করার কথা বলেছেন; বলেছেন ১১টি জেলায় প্রাথমিকের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কথা। মাধ্যমিকে তথ্য–প্রযুক্তি শিক্ষা এবং মাল্টিমিডিয়া উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করতে সরকারি উদ্যোগের কথাও এসেছে। এসেছে কারিগরি, মাদ্রাসা ও ভোকেশনাল শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার চিন্তাও।

মোটাদাগে, শিক্ষা খাতের অবকাঠামো উন্নয়নে সরকারের অগ্রাধিকারের বিষয়টিই অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা থেকে লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়টি যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, গুণগত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা তার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সরকারের উচিত শিক্ষকদের সর্বাধুনিক প্রশিক্ষণের বিষয়টিতে আরও অনেক বেশি নজর দেওয়া। উচ্চশিক্ষায় সরকারের যা ব্যয় তার

বেশিরভাগই চলে যাচ্ছে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতায়; গবেষণায় তুলনামূলকভাবে কিছুই থাকছে না।

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে যে সকল অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন। তারপরও বলতেই হচ্ছে, এ বাজেট বরাদ্দে শিক্ষা বাজেটে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর বাস্তবায়নে সরকারি অগ্রাধিকারের বিষয়টি প্রতিফলিত হয়নি। তার জন্য যে হারে বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন, গত কয়েক বছরের বাজেটে তা দেখা যাচ্ছে না। 'সবার জন্য গুণগত শিক্ষা' নিশ্চিতের বিষয়েও সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই।

আমাদের বাজেট বরাদ্দ ও এর বাস্তবায়নের পুরো বিষয়টি সাধারণত কেন্দ্র থেকেই পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও প্রতিষ্ঠানগুলোর করণীয় থাকে খুবই কম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি-উপবৃত্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকারের ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগানো হচ্ছে। সামনের বাজেটগুলোতে বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক-কর্মকর্তা নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের দীর্ঘসূত্রিতা কমাতে এই ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগানো যায় কিনা, সরকার তা ভেবে দেখতে পারে। ভেবে দেখতে পারে অভিভাবক ও স্থানীয় জনগণকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আরও কার্যকরভাবে কী করে যুক্ত করা যায়।

লেখচিত্র: শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দ - মোট বাজেট ও জিডিপি'র শতকরা হার

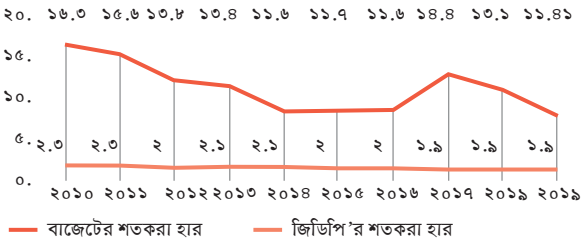

তথ্যসূত্র: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার (বিভিন্ন বছর) ও লেখকের নিজস্ব হিসাব

প্রস্তাবনা

- বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে মোট বাজেটের ন্যূনতম ১৮% বরাদ্দ দেয়ার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করছি এবং পর্যায়ক্রমে ১-২% বৃদ্ধি করে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে ২০%-এ উন্নীত করার দাবি করছি।
- বরাদ্দকৃত অর্থেও যথাযথ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে জেলা ও উপজেলাভিত্তিক শিক্ষা পরিকল্পনা, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন শুরু করার দাবি করছি।
- শিক্ষকতা পেশায় মেধাবীদের আকৃষ্ট এবং তাদের পেশাজীবিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি, চারবছর মেয়াদী কোর্স প্রচলন, শিক্ষকদের জন্য যুগোপযোগী বেতন কাঠামো প্রণয়ন, বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ এবং নিয়োগের পূর্বে তাদের প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা এবং এর জন্য জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা।
- শিক্ষা উপবৃত্তির টাকার পরিমান মাথাপিছু ১০০ থেকে বৃদ্ধি করে কমপক্ষে ৩০০ টাকায় উন্নীত করতে হবে।
- বিজ্ঞান শিক্ষায় অধিক শিক্ষার্থী আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাইব্রেরি সম্প্রসারণের পাশাপাশি বিজ্ঞানাগার, কম্পিউটার ল্যাব ইত্যাদি স্থাপনাসহ সহজ ভাষার বিজ্ঞান পুস্তিকা সরবরাহ করে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য যথাযথ বরাদ্দ প্রদান করার জন্য সুপারিশ রাখছি।
- এটি আনন্দের বিষয় যে, উচ্চশিক্ষায় বিশেষ করে টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষা, চিকিৎসা শিক্ষা, প্রকৌশল শিক্ষাসহ শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সে তুলনায় আবাসন, যাতায়াত সুবিধাসহ জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো বাড়ছে না। সামনের অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে এ ধরনের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আবাসনসহ নারী শিক্ষার্থীবান্ধব প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।
- Draft School Feeding Policy অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের প্রত্যন্ত ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চল বিশেষ করে চর, হাওর, চা বাগান, পার্বত্য ও আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল এবং নগরীর বস্তি এলাকার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা।
- সকল ধরণের প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাব্যবস্থাসহ তাদের উপযোগী প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব শিক্ষা উপকরণের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ প্রদান করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে গবেষণাকে উৎসাহিত করতে এ খাতে বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বাড়ানো।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবাখাত ও জাতীয় বাজেট

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা খাত

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্যসেবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার এবং সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত মানব উন্নয়নের সূচক। এ কারণে সাংবিধানিকভাবে ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টিকে মানুষের সার্বিক সক্ষমতার জন্য অগ্রাধিকার দিয়ে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থান দেয়া হয়েছে।

মানব উন্নয়নের সূচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ এ খাতে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকার অগ্রাধিকারের কথা বলে থাকে। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে দেখা যায় দরিদ্র, প্রান্তিক জনগণ এখনো স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবার ওপর পরিচালিত একটি সামাজিক নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, স্বাস্থ্যখাতে বিরাজমান সমস্যাগুলোর মধ্যে জনবল সংকট, চিকিৎসা সেবার জন্য পর্যাপ্ত যন্ত্রপাতি এবং উপকরণের অভাব, অবকাঠামোর অভাব, আঞ্চলিক বৈষম্য, বাজেটে অপর্যাপ্ত বরাদ্দ এবং সর্বোপরি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও ব্যবস্থাপনার ঘাটতি রয়েছে।

উন্নয়নের উপায় ও লক্ষ্য হলো মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সে কারণে সক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। কেননা স্বাস্থ্যসেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতের উন্নয়ন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিই নয়, এটি জীবনের গুণগত মান ও সামাজিক প্রগতির ভিত্তি স্বরূপ। এছাড়া স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নকে দারিদ্র্য নিরসনের কৌশল হিসাবেও গণ্য করা হয়। সমাজের সুষম উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতে শ্রেণি-লিঙ্গ-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের অভিগম্যতা নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক।

ধনী-গরীব সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবায় সরকারি বরাদ্দের ঘাটতি, ব্যক্তি পর্যায়ে অত্যাধিক ব্যয়, সুশাসনের অভাব, স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে গ্রাম-শহর, ধনী-দরিদ্র অসম সুযোগ ও বঞ্চনা সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এর সাথে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবায় জনবল সংকট ও এর বিন্যাসে আঞ্চলিক বৈষম্য; রয়েছে অবকাঠামো, আধুনিক যন্ত্রপাতি, জবাবদিহিতা ও ব্যবস্থাপনার সংকট। এজন্য স্বাস্থ্যখাতের বাজেট বিশ্লেষণ ও জনঅংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেট বরাদ্দে সবার জন্য স্বাস্থ্যের বিষয়টি অগ্রাধিকার হিসাবে বলা হলেও এই খাতে প্রধান সমস্যাগুলো সমাধানের বিষয়টি আমাদের জাতীয় বাজেটে খুব একটা প্রাধান্য পায় না। আমাদের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দাতাদের নির্দেশিত উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রভাব থাকায় স্বাস্থ্যের মত সেবাখাতগুলোতে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় নিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এতে বাড়ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য। ফলে দেখা যাচ্ছে, সেবা খাতগুলোতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ছে না, অনেক ক্ষেত্রে নিম্নগামী।

বাজেট কেন্দ্রীয়ভাবে প্রণীত হয় বলে, এখানে অঞ্চলভিত্তিক অগ্রাধিকারমূলক চাহিদাগুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয়না এবং বাজেটের সুষম বণ্টন হয়না। এছাড়া বরাদ্দকৃত বাজেটের যথাযথ ও কার্যকর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব থাকায় জনগণ যে সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে যে ধরনের সেবা পাওয়ার কথা তা পায় না। দেখা যায়, স্বাস্থ্যসেবার জন্য সরকারিভাবে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে সকল মানুষের তথ্যে অভিগম্যতা না থাকায় সাধারণ জনগণ সেবা প্রাপ্তি থেকে নিয়মিত বঞ্চিত হচ্ছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির চাহিদা শ্রেণি-লিঙ্গ-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের। সরকারি অর্থের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যদিয়ে দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগণ যাতে তাদের প্রাপ্য সেবা পায় সেজন্য রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিতে হবে।

স্বাস্থ্যখাতে রুগ্ন বাজেট

জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ টাকার অংশ বাড়লেও মূল বাজেট ও জিডিপি অনুপাতে বাড়েনি। গত কয়েক বছর ধরে জাতীয় বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ মোট বাজেটের তুলনায় ও জিডিপি'র শতকরা হার কমেছে। বর্তমান সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে এসেছে ২০০৯ সালে, ক্ষমতায় আসার পর ২০০৯-১০ সালে যে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছিল

তাতে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ৬.২ শতাংশ এবং জিডিপির ০.৯০ শতাংশ; আর সেখানে সর্বশেষ ২০১৮-১৯ বাজেটে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে মোট বাজেটের ৫.০ শতাংশ এবং জিডিপির ০.৯ শতাংশ। প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ টাকার অঙ্কে বাড়লেও মোট বাজেট ও জিডিপি'র অনুপাতে সেই পরিমাণ হতাশাব্যাঞ্জক।

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো ৩% এবং দাতা সংস্থাগুলো ৭% পর্যন্ত ব্যয় বহন করে থাকে। আন্তর্জাতিক মানদন্ডে বাংলাদেশের মাথাপিছু স্বাস্থ্যব্যয় (সরকারি, বেসরকারি এবং ব্যক্তিগত) সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে। যা মাত্র ২৭ ডলার। যেখানে ভারতে ৬১ ডলার এবং মালয়েশিয়ায় ৪১০ ডলার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে স্বাস্থ্য সেবায় মান উন্নয়নের জন্য এই খাতে ব্যয় হওয়া

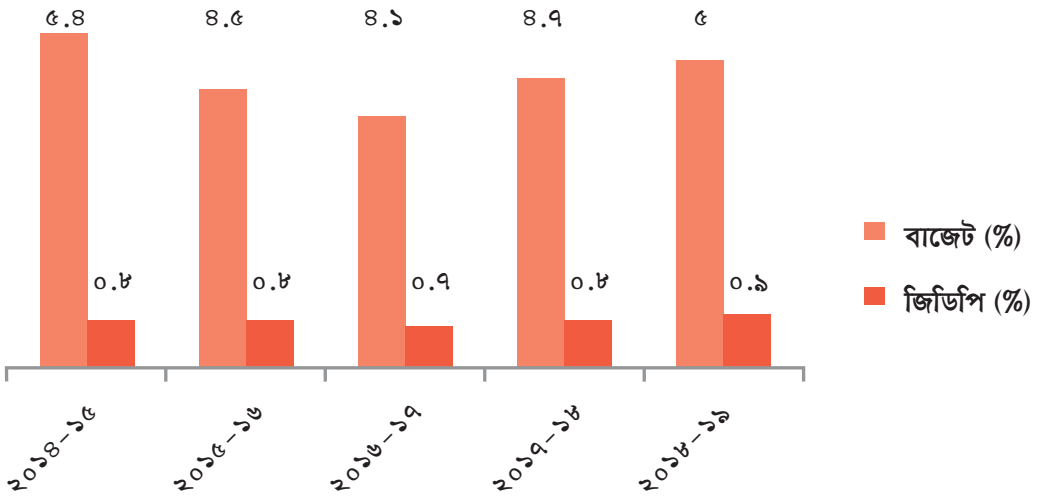

সূত্র: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার, অর্থ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খরচ: সরকারি খরচ সর্বনিম্ন এবং ব্যক্তিপর্যায়ে খরচ সর্বোচ্চ

সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে রোগীর নিজস্ব অর্থ খরচ সবচেয়ে বেশি এবং এই খরচ ক্রমেই বাড়ছে। বর্তমানে দেশের মোট স্বাস্থ্যব্যয়ের মাত্র ২৩ শতাংশ বহন করে সরকার, ১৯৯৭ সালে সরকারের অংশ ছিল ৩৭%। বেসরকারি এনজিও ও আবশ্যিক ৪০ ডলার। স্বাস্থ্যখাতে ন্যূনতম ব্যয়ে বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। লক্ষণীয় বিষয় হলো: এই দেশগুলোর মধ্যে মোট স্বাস্থ্যব্যয়ের সরকারি ব্যয় বাংলাদেশে সবচেয়ে কম (২৩%)। যেখানে ভারতে ৩৩% এবং নেপালে ৪০%। অপরদিকে স্বাস্থ্যখাতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যয়ে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ (৬৩.৩%), ভারত ৫৭.৩% এবং নেপাল ৪৯.২%।

দেশের নাম	ব্যক্তিগত ব্যয়	সরকারি ব্যয়	অন্যান্য ব্যয়
মালয়েশিয়া	৩৫.৬%	৫৫%	৯.৪%
থাইল্যান্ড	১৩.১%	৭৬%	১০.৫%
শ্রীলংকা	৪৯.৯%	৪০%	১০.৩%
ভারত	৩৩%	৫৭.৩%	৯.৩%
পাকিস্তান	৬১.৯%	৩১%	৬.৭%
নেপাল	৪৯.২%	৪০%	১১.৩%
বাংলাদেশ	৬৩.৪%	২৩.৭%	১৩%

তথ্য সূত্র: Bangladesh National Health Accounts 1997-2012, Ministry of Health and Family Welfare, Gov of Bangladesh

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত: জনবল সংকট ও দূরাবস্থা

বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মাপকাঠি অনুযায়ী জনসংখ্যা অনুপাতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবলের ও অভাব রয়েছে। আবার এই জনবলের মধ্যে রয়েছে আনুপাতিকভাবে ভারসাম্যের অভাব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য স্বাস্থ্যকর্মী প্রয়োজন কমপক্ষে ২৩ জন। সেখানে বাংলাদেশে রয়েছে মাত্র ৫.৮ জন। যেখানে চিকিৎসক ও নার্সের অনুপাত হবে ১.৩; বাংলাদেশে চিকিৎসক নার্সের আনুপাতিক হার ০.৬।

উপযোগী বাহনের কোন ব্যবস্থা নেই। অপরদিকে ঐতিহ্যবাহী লোকজ অভিজ্ঞতা ও চিকিৎসা পদ্ধতি কাজে লাগানোর বিষয়ে বরাদ্দের ক্ষেত্রে জাতীয় বাজেট সম্পূর্ণভাবে উদাসীন।

এছাড়াও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠী ও ক্রমবর্ধমান প্রবীণ জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবার বিষয়টি জাতীয় বাজেটে উপেক্ষিত। বাংলাদেশে ৬০ বছরের বেশি বর্তমান জনসংখ্যা ৯.৮ মিলিয়ন (৬.৫% মোট জনসংখ্যার)। যা আগামী ২০২৬ সনে হবে ১৮.২ মিলিয়ন। বাজেটে প্রবীণ স্বাস্থ্যসেবা খাতে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা থাকা

সার্কভুক্ত দেশসমূহের তুলনামূলক চিত্র: প্রতি ১০,০০০ জনে স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যার অনুপাত:

দেশের নাম	চিকিৎসক	নার্স ও ধাত্রী	চিকিৎসক, নার্স ও ধাত্রী	চিকিৎসক, নার্স অনুপাত
বাংলাদেশ	৩.৬	২.২	৫.৮	০.৬
ভারত	৭	১৭.১	২৪.১	২.২
নেপাল	১.৭	৫	৬.৭	২.৯
ভুটান	২.৬	৯.৮	১২.৪	৩.৮
শ্রীলংকা	৬.৮	১৬.৪	২৩.২	২.২

যুক্তরাজ্য থেকে প্রকাশিত চিকিৎসা সাময়িকী ল্যান্ডসেটের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা দানকারীদের ৯৪% অদক্ষ। চিকিৎক তৈরির সব প্রতিষ্ঠান মানসম্মত নয়। সেইসাথে রয়েছে সরকারি হাসপাতালগুলোতে শূণ্য পদ পূরণের বিলম্ব ও বিন্যাসে বৈষম্য। অপরদিকে যেসকল জেলাসমূহে দরিদ্রতা মাত্রা বেশি সেসব জেলা স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দে এখনো পিছিয়ে আছে। যেসব জেলায় ধনী মানুষের বসতি বেশি সেসব জেলায় সরকারি ব্যয়ও বেশি। মোট স্বাস্থ্য বাজেটের ৪১% ব্যয় হয় ঢাকা জেলায়, চট্টগ্রাম জেলায় ব্যয় হয় ১৮%। সবচেয়ে কম ব্যয় হয় সিলেট ও বরিশাল বিভাগে মাত্র ৪% ও ৫%।

স্বাস্থ্যখাতে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে বাজেট প্রক্রিয়া কেন্দ্রীভূত। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রণীত বিধিমালা অনুসারে উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ও তার নিচের প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বাস্থ্য বাজেট নির্ধারিত হয়। এখানে জেলার সিভিল সার্জন কার্যালয়ের কোনো ভূমিকা নেই। সুযোগ নেই স্থানীয় চাহিদার আলোকে নতুন কোন খাত অন্তর্ভুক্তির বা কোন খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধির। দেশের উপকূল, চরাঞ্চল, হাওড় ও দুর্গম পার্বত্যাঞ্চল যেখানে দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে সেবা নেয়ার সুযোগ সীমিত, সেখানে অঞ্চলভিত্তিক চিকিৎসা সেবা বা

উচিত। এজন্য কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত সকল স্বাস্থ্যকর্মীর ফিজিওথেরাপি প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশ সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্জনে ইতোমধ্যে অনেকখানি সফলতা অর্জন করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাবে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ২০০০ সালে ছিল ৬৫.৩ বছর যা বর্তমানে ৭২.০০ বছরে উন্নীত হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা সুবিধা পেয়ে থাকে ৭৩%; শিশুদের টিকা দানের অর্জন ৯৭%; অত্যাবশ্যকীয় ঔষধ সুবিধার আওতায় আনা হয়েছে ৬৫% মানুষকে; মাতৃমৃত্যু হার ২০১৮ সালে প্রতি একলাখে ১৭২ জন যা ২০১৫ সালে ছিল ১৮১ জন; প্রতি ১ হাজারে নবজাতকের মৃত্যু ২০১৫ সালে ছিল ২০, যা ২০১৮ সালে কমে হয় ১৭ জন। ৫ বছরের নিচে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজার জনে ২০০০ সালে ছিল ৮৮ জন, যা ২০১৬ সালে ৩০ জনে নেমে এসেছে।

স্বাস্থ্যসেবা যাদের প্রয়োজন তারা তা সব সময় সমানভাবে পায় না। ধনী-গরিবের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষ করে বেসরকারি পর্যায়ে ব্যবধান করছে। বেসরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা অন্য সব পণ্যের মতোই যেন কেনা-বেচার ব্যাপার। অথচ এর সাথে মানুষের বাঁচা-মরা, রোগ পরবর্তী জীবন যাপনের সম্পর্ক রয়েছে। কেউ সঠিক চিকিৎসা না

পেলে অনেক ক্ষেত্রে আজীবন পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়; তখন তারা অন্যের এবং সমাজের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়।

আমাদের দেশে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। সরকারি স্বাস্থ্যসেবা বিনামূল্যে সরবরাহ করা হলেও সাম্প্রতিক সময়ের এক গবেষণা অনুযায়ী দেশে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য ৬৪% খরচই পকেট হতে বহন করতে হয়। ইতোপূর্বে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের ২০০৬-২০০৭ সালের একটি জরিপেও দেখা গেছে, স্বাস্থ্যসেবা নিতে গেলে প্রধান খরচ (৬৪%) জনগণই বহন করে, ২৬% সরকার বহন করে এবং বাকী ছিটে ফোটা বহন করে এনজিও, প্রাইভেট সেক্টর, ইন্সুরেন্স কোম্পানী ইত্যাদি (মোঃ আসাদুল ইসলাম, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)।

প্রতিরোধ ও প্রতিকারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সবার জন্য সর্বত্র সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব। শুধুমাত্র প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিরাপদ ও পুষ্টিমান সম্পন্ন খাদ্য, সুস্থ পরিবেশ, দূষণমুক্ত পানি ও বায়ু, মাদক ও তামাকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, মাঠ, পার্ক, জলাধার, হাঁটার পথ ব্যবহার উপযোগিতার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাসপাতাল ও ডায়াগনোস্টিক সেন্টার স্থাপন, চিকিৎসক, সেবিকা, প্যারামেডিক্স ও অন্য সহযোগি নিয়োগ, তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানসম্মত দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করতে হবে। এছাড়াও জনগণকে সচেতন করতে হবে।

স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব রয়েছে। চিকিৎসার জন্য সামান্য খরচের সামর্থ্যটুকুও অনেকের নেই। তাই নিরুপায় হয়ে চিকিৎসককে এড়াতে গিয়ে তারা হাতুড়ে ডাক্তার, কবিরাজ, ওঝা-বৈদ্য এমনটি ভুয়া পীরদের কাছে অপচিকিৎসার শিকার হচ্ছে।

সুপারিশ

১. বাংলাদেশের স্বাস্থখাতে বাজেট প্রণয়নে কেন্দ্রীভূত প্রক্রিয়া থেকে সরে আসতে হবে। জেলা পর্যায়ের সমন্বয় ও স্থানীয় চাহিদার আলোকে বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু কতে হবে;

২. স্বাস্থ্যখাতে সকল শূণ্যপদ অনতিবিলম্বে পূরণ করতে হবে। প্রত্যন্ত ও পার্বত্য অঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবার দিকে সরকারের নজর দিতে হবে। চরাঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় 'রিভার এম্বুলেন্স' প্রদান করতে হবে;

৩. স্বাস্থ্য বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থের অসমতা দূর করতে হবে। অঞ্চলভিত্তিক চাহিদা ও প্রয়োজনেরভিত্তিতে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। সারাদেশে দক্ষ চিকিৎসকের সুষম বন্টন এবং অধিক সংখ্যক নার্স তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

৪. চিকিৎসকদের নিয়মিত কর্মস্থলে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে; এর সাথে সাথে স্বাস্থ্যখাতে সকল প্রকার অপচয়, অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতি দূর করতে হবে। ওষুধ শিল্পের মান ও মূল্য উভয়ই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে;

৫. স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে লোকজ জ্ঞান ও চিকিৎসকদের মূল্যায়ন ও উৎকর্ষ সাধনে যথাযথ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে;

৬. সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রতিটি হাসপাতালে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা সচল ও নিয়মিত করতে হবে;

৭. ব্যক্তি পর্যায়ে ও সরকারি পর্যায়ে চিকিৎসা ব্যয়ের অসমতা দূর করতে হবে;

৮. টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে এবং সকলের জন্য মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারকে বাস্তবসম্মত পথ নির্দেশিকা ঘোষণা করা এবং সম্ভব হলে সকলের জন্য সরকারিভাবে স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা ও কৃষি বাজেট

সূচনা

আমাদের জাতীয় জীবনে কৃষিখাত শুধুমাত্র খাদ্য সার্বভৌমত্বের প্রশ্নেই গুরুত্বপূর্ণ নয়; এ খাতে নিয়োজিত রয়েছে আমাদের শ্রমশক্তির সবচেয়ে বড় অংশ- ৪০.৬ শতাংশ।[১] অপরদিকে জিডিপিতে কৃষির অবদান ক্রমান্বয়ে কমছে। সর্বশেষ সরকারি হিসেবে অনুযায়ী জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ১৩.৩১%। বাংলাদেশের কৃষি মূলতঃ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক জোত নির্ভর। অর্ধেকেরও বেশি কৃষক পরিবার ভূমিহীন। এই ভূমিহীন বর্গাচাষী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক গত ৪৭ বছরে খাদ্যশস্য উৎপদন চারগুণ বাড়িয়েছে। প্রতিকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের সমস্যা মোকাবেলা করে নতুন প্রযুক্তির সাথে খাপ খাইয়ে নিজেদের সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈচিত্র এসেছে। এ পরিবর্তন কৃষিতে নতুন কিছু সংকট, সম্ভাবনা ও ঝুঁকি তৈরি করেছে। কৃষিতে সরকারি বিনিয়োগ এ সংকট সম্ভাবনাকে কিভাবে মোকাবেলা করছে এবং কৃষির প্রধান চালিকাশক্তি ক্ষুদ্র- প্রান্তিক ও বর্গচাষীকে কিভাবে সহায়তা করছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান ও সমাধানের পথ খোঁজা বাংলাদেশের কষি ও কৃষকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষিখাতে বাজেট বরাদ্দের স্বল্পতা

কৃষিখাতে রয়েছে বাজেট বরাদ্দের স্বল্পতা, বাজেট বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা, সুশাসনের অভাব, কর্পোরেট স্বার্থে প্রণীত নীতিকাঠামো ও কৃষির কাঠামোগত সংকট। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ৪ লাখ ৪৬ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকার বাজেটে কৃষিখাতে বরাদ্দ ছিল সর্বমোট ২৬ হাজার ২৬০ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ৫.৭ শতাংশ। ২০১০-১১ থেকে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত মোট বাজেট ২৫৫.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও সার্বিক কৃষিখাতে বরাদ্দ বেড়েছে ৯৯.০৩ শতাংশ। বর্তমান সরকারের চলমান দুই মেয়াদে দেখা যায়, ২০০৯-১০ অর্থবছরের কৃষিখাতে বরাদ্দ ছিল মোট বাজেটের ১০.৯ শতাংশ আর ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তা নেমে এসেছে মোট বাজেটের ৫.৭ শতাংশে। এই ৫.৭ শতাংশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ। শুধু কৃষি মন্ত্রণালয়ের বাজেট পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি-মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৬৭৬ কোটি টাকা (৪.০১%)।

কৃষি-ভর্তুকি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে

কৃষি বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক অগ্রাধিকার হলেও বাজেটে কৃষি-ভর্তুকির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। বিগত তিন বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি-ভর্তুকি ৯০০০ কোটি টাকায় আটকে ছিল, যা সংশোধিত বাজেটে কমে গিয়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬০০০ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হয়। ভর্তুকির ক্ষেত্রে সার, বীজ, সেচ সুবিধা গেলে ক্ষুদ্র কৃষক উপকৃত হবে। কৃষকদের কৃষিযন্ত্র সংগ্রহে উৎসাহিত করতে কিছু যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ৫০ শতাংশ ভর্তুকি প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছে। এটি ভালো উদ্যোগ হলেও এর ব্যাপ্তি যেমন

লেখচিত্র ১: জাতীয় বাজেটে কৃষিখাতে বরাদ্দের শতকরা হার, ২০১১-২০১৯

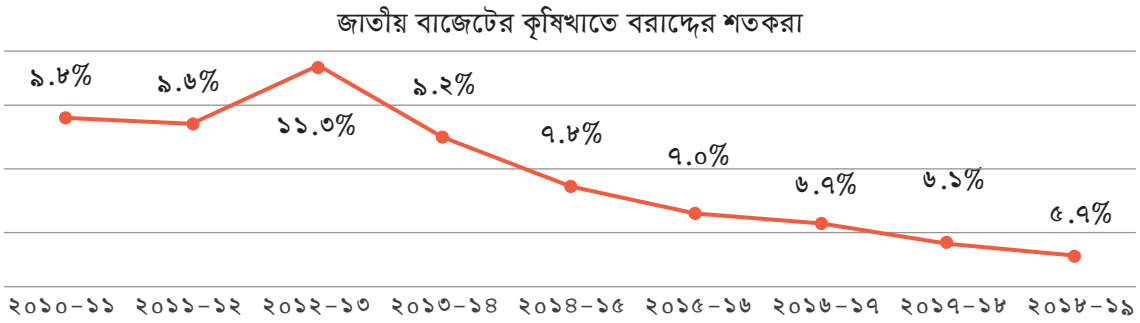

সূত্র: বাজেটের সংক্ষিপ্তসার

[১] শ্রমশক্তি জরিপ ২০১৭

খুবই কম অন্যদিকে এই জাতীয় বড় যন্ত্র সাধারণত: ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য প্রয়োজন পড়ে না। দেশে কৃষিজ উৎপাদন বাড়লেও কৃষিখাতে জনপ্রতি ব্যয় বেড়েই চলছে। আইএফপিআরআইয়ের গ্লোবাল ফুড পলিসি রিপোর্টেও তথ্যানুযায়ী, ১৯৮০ সালে কৃষিখাতে জনপ্রতি ব্যয় ছিল ৩ দশমিক ৫৬ ডলার। ২০১৪ সালে এসে এ ব্যয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ দশমিক ৪১ ডলারে। তাই কৃষি-ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ব্যয় কমানোর বিকল্প নেই।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে আগামী ২০৩০ সাল নাগাদ সকল মানুষের জন্য খাদ্য ও পুষ্টির নিশ্চিত করতে হলে প্রতিবছর উৎপাদন বাড়িয়ে যেতে হবে গড়ে ৪ থেকে ৫ শতাংশ হারে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এ লক্ষ্যমাত্রা নামিয়ে সর্বোচ্চ ৩.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হলেও গত ৩ বছর ধরে এ লক্ষ্যমাত্রাও অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না।[২] কৃষিখাতে মূল বরাদ্দ ও ভর্তুকি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ানো না গেলে ভবিষ্যতেও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কঠিন হবে। ফলে আমাদের নির্ভরশীল হতে হবে কৃষিপণ্য আমদানির ওপর, যা গত কয়েক বছর ধরে ক্রমশ বেড়েই চলছে। এ ক্ষেত্রে আমদানি বিকল্প নীতি গ্রহণ করে কৃষির অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষিখাতকে অগ্রাধিকার দিয়ে বাজেট প্রণয়ন করতে হবে।

দারিদ্র্য হ্রাসে	কৃষি উৎপাদন	দারিদ্র্য হ্রাস
কৃষি খাতের অবদান	১%	০.৫%

কৃষক কৃষিপণ্যের লাভজনক মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে

ভোক্তামূল্য কম রাখতে সরকার যতটা তৎপর। কৃষকের জন্য লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করাটাও একইভাবে গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে যাদের মুখ্য অবদান সেই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের উৎপাদিত কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে দরকার কৃষিপণ্যের মূল্য সমর্থন এবং ন্যায্য সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা। পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে দেশে খাদ্যশস্য ধান/গম ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি মূল্য সহায়তায় মূলত: চালকল মালিকরাই লাভবান হন। তাছাড়া সরকারি ক্রয়মূল্য চলতি বাজার দরের চেয়ে কখনো কখনো কম থাকে এবং তা বাজারে পণ্যমূল্যের ওপর প্রভাব ফেলার জন্য তা যথেষ্ট নয়। বর্তমানে সরকারি সংগ্রহের পরিমাণ মোট উৎপাদনের প্রায় ৪ শতাংশ।[৩] এটি ন্যূনপক্ষে ৮ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে এবং সরাসরি কৃষকের খামার থেকে ক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। তাছাড়া পাট, ডাল ও তেলবীজসহ অন্যান্য ফসলের জন্যও সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা জরুরি। সাম্প্রতিক 'ন্যাশনাল সার্ভে অ্যান্ড সেগমেন্টেশন অব স্মলহোল্ডার হাউজহোল্ডস ইন বাংলাদেশ' জরিপে দেখা যায়, উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার কারণে তারা দারিদ্র্য অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। 'ক্রেতাদের সুযোগ নেয়ার প্রবণতা, পরিবহন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোর অভাব এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণে ফসলের ন্যায্যমূল্যও পাচ্ছেন না তারা। জরিপে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ক্রেতাদের সুযোগ নেয়ার প্রবণতার কথা জানিয়েছেন ৪৪ শতাংশ। যোগাযোগ অবকাঠামোর অভাব ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের দিকে আঙুল তুলেছেন যথাক্রমে ১৪ ও ১১ শতাংশ ক্ষুদ্র কৃষক।'

কৃষিঋণ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল

কৃষিতে বিনিয়োগ প্রয়োজনের তুলনায় সবসময়ই অপ্রতুল। কৃষি আমাদের সবচেয়ে বড় ব্যাক্তিখাত হলেও, শিল্পখাতের প্রতি যে রকম গুরুত্ব দেওয়া হয় কৃষিখাতের প্রতি রাষ্ট্র ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সেই মনোযোগ নেই। ইতোমধ্যে সরকার ১০ টাকা জমা দিয়ে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা, ন্যূনপক্ষে ২৫ শতাংশ ঋণ কৃষিখাতে প্রদানের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা দেওয়া, মসলা ফসলের জন্য ৪ শতাংশ সুদে এবং দুগ্ধ খামার স্থাপনের জন্য ৫ শতাংশ সুদে ঋণ দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করেছে। কিন্তু, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার সুযোগ নিতে পারে না। সরকারি হিসেবে কৃষিঋণ বিতরণের পরিমাণ বাড়লেও সত্যিকারার্থে কতজন কৃষক কৃষিঋণ পেয়েছে তা একটি বড় প্রশ্ন। এছাড়াও, এখনো কৃষিঋণে সুদেও পরিমাণ বেশি, কৃষিঋণের সুদের হার ৬ শতাংশে নামিয়ে আনা জরুরি । দারিদ্র্য হ্রাসকরণে কৃষিখাতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সম্প্রতি দেশে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায়, কৃষি উৎপাদন ১ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে দারিদ্র্যের হার ০.৪১ শতাংশ হ্রাস পায়।[৫] স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ৩.১ শতাংশ হারে। এ সময় দেশে দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে বছরে গড়ে

[২] http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/opinions/2018/05/09/275817.html
[৩] আসন্ন বাজেট ও কৃষি খাত, ড. জাহাঙ্গীর আলম, ২৫ মে, ২০১৭
[৪] দৈনিক প্রথম আলো, ১২ জুলাই ২০১৭
[৫] Strategic Agricultural Sector and Food Security Diagnostic for Bangladesh, BRAC and the UK's Department for International Development./ http://www.thedailystar.net/business/agriculture-vital-poverty-reduction-study-1353934
[৬] http://www.jugantor.com/

১.৪ শতাংশ হারে।[৩] কৃষিখাতে উৎপাদন বাড়লে খাদ্য ও পুষ্টির সরবরাহ বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যপণ্যের মূল্যে স্থিতিশীলতা আসার ফলে তা দ্বিগুণ হারে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস করে। তাই দারিদ্র্য হ্রাসের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্যও কৃষিতে বিনিয়োগ করা জরুরি।

কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য না পাওয়ার প্রধান কারণ

যোগাযোগ
অবকাঠামোর অভাব
১৪ শতাংশ
ক্ষুদ্র-কৃষকের অভিমত

মধ্যস্বত্বভোগী দৌরাত্ম্য
১১ শতাংশ
ক্ষুদ্র-কৃষকের অভিমত

জৈবকৃষি

২০১৬ সালে বর্তমান সরকার কৃষি ব্যবস্থাকে টেকসই করার লক্ষ্যে 'জাতীয় জৈব কৃষিনীতি' প্রণয়ন করেছে। যা টেকসই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। যদিও, জীব প্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন, বর্ধিতকরণ, মাননিরূপণ ও প্রযুক্তি বিস্তারে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৫ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। অন্যদিকে, বিএডিসির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ সীমিত, যা বীজের ওপর কৃষকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও জলবায়ু সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবনে বিএডিসিকে সহায়তা করবে না।

বায়ো-ফুয়েল উৎপাদন স্থায়ীভাবে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করবে। চালের খুদ, ভুট্টা ও চিটা গুড় ব্যবহার করে খাদ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদন এবং প্লান্ট তৈরির সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে বাতিল করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চীনসহ অনেক দেশে খাদ্যশস্য থেকে ইথানল তৈরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই, আমরা মনে করি সরকারকে অবশ্যই খাদ্য থেকে জ্বালানি তৈরির সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে আগে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে হবে।

সুপারিশমালা

১. জাতীয় বাজেটের ২০ শতাংশ কৃষিতে বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। দেশের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও সকল মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতি সংস্কার এবং সে অনুযায়ী কৃষিতে বাজেট বরাদ্দ প্রদান করতে হবে:

২. বর্গাচাষী, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের জন্য সরকারি সুবিধা ও উপকরণ সহায়তা প্রদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও ভূমিহীন কৃষকদের জন্য সুদবিহীন বা স্বল্পসুদে মৌসুমভিত্তিক কৃষিঋণ সহজলভ্য করতে হবে;

৩. কৃষিপণ্যের মূল্য নির্ধারণ ও সরকারি-বেসরকারি কৃষিপণ্য ক্রয়পদ্ধতিতে সংস্কার আনতে 'জাতীয় কৃষি পণ্য মূল্য কমিশন' গঠন করতে হবে। কৃষকের উৎপাদন খরচ বিবেচনা করে ধানের আগাম মূল্য ঘোষণা করতে হবে এবং নির্ধারিত ডিলারের কাছে কৃষকেরা যাতে সরাসরি ধান বা কৃষি সমবায়গুলো তাদের প্রক্রিয়াজাতকৃত চাল বিক্রি করতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। প্রকৃত কৃষকদের নিয়ে 'উৎপাদন ও বিপণন সমবায়' গঠন করে সমবায়ের মাধ্যমে কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও হিমাগার স্থাপন করতে হবে। 'শস্য গুদাম ঋণ প্রকল্প'কে পুনরুজ্জীবিত করে 'শস্য সংরক্ষণ ঋণ' চালু করতে হবে।

৪. নারী কৃষকদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ঋণসহ সকল সরকারি পরিসেবা ও প্রণোদনায় অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে। নারীবান্ধব কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগ করতে হবে।

৫. কৃষি জমির অকৃষিখাতে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। 'ভূমি ব্যাংক' ব্যবস্থা চালু করে অনুপস্থিত ভূমিমালিকদের কাছ থেকে জমি 'ভূমি ব্যাংকে' জমা নিয়ে তা প্রকৃত কৃষকদের চাষাবাদের জন্য সহজলভ্য করা যেতে পারে। কৃষিজমি সুরক্ষা আইন প্রণয়ন করতে হবে;

৬. জলবায়ু পরিবর্তনের হুমকি মোকাবিলা করে জলবায়ু সহিষ্ণু স্থায়িত্বশীল কৃষিকে উৎসাহিত করতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং গবেষণাখাতে বরাদ্দ রাখতে হবে;

৭. ক্ষতিকর বিদেশি বীজ আমদানি বন্ধ, বিটি বেগুন, গোল্ডেন রাইসসহ বিতর্কিত জিএমও কৃষি প্রবর্তন বন্ধ করতে হবে। ফসলভিত্তিক আঞ্চলিক বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণাগার তৈরি করতে হবে। বীজ সার্বভৌমত্ব অর্জনে বিএডিসিকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে।

জাতীয় বাজেটে শ্রম ও কর্মসংস্থান খাত

শ্রম ও কর্মসংস্থান চিত্রে বাংলাদেশ

'শ্রমশক্তি জরিপ ২০৬-১৭' অনুযায়ী, বাংলাদেশে ১৫ বছরের উর্ধ্বে মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১০ কোটি ৯০ লক্ষ। মোট 'শ্রমশক্তি' ৬ কোটি ৩৫ লক্ষ। শ্রমশক্তির অন্তর্ভুক্ত নয় (শিক্ষার্থী, অমূল্যায়িত গৃহস্থলী কাজে নিয়োজিত ইত্যাদি)- ৪ কোটি ৫৫ লক্ষ। মোট শ্রমশক্তির ৪০.৬ শতাংশ কৃষিতে, ২০.৪ শতাংশ শিল্পে এবং ৩৯.০ শতাংশ সেবা খাতে নিয়েজিত আছে। দেশে বেকার জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মাত্র ২৬ লক্ষ ৭৭ হাজার অর্থাৎ ৪.২ শতাংশ। দেশে যুব শ্রমশক্তির সংখ্যা ২ কোটি যা মোট শ্রমশক্তির ৩১.৬ শতাংশ। যুব শ্রমশক্তির মধ্যে বেকারত্বের হার ১০.৬ শতাংশ। বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের হিসাব ও অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ থেকে এটা দেখা যায় যে, দেশে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা সরকারি হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি। কারো কারো মতে এটা ১৪-১৬ শতাংশ। অন্য অনেকের হিসাব মতে, দেশে আসলে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যে পদ্ধতিতে বেকারত্ব পরিমাপ করা হয়, সেখানে 'পদ্ধতিগত' কিছু ত্রুটি থাকায় জরিপে বেকারত্বের প্রকৃত চিত্র উঠে আসে না।

সরকারি হিসাব মতে, দেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ কাজের সন্ধানে শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে। দেশীয় বাজারে ১০-১১ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে এবং ৪ লক্ষ মানুষ বিদেশে কাজ পাচ্ছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের এই কথ্য-উপাত্ত কতোটা নির্ভরযোগ্য- তা প্রশ্ন সাপেক্ষ।

আমাদের অর্থনীতি ব্যক্তিখাত নির্ভর। আমাদের মোট কর্মসংস্থানের মাত্র ৩.৮ শতাংশ সরকারি খাতের। বাকি ৯৬.২ শতাংশই কোন না কোনভাবে ব্যক্তিখাতের। ফলে ব্যক্তি খাত বা বেসরকারি খাতে বিনিয়োগই কর্মসংস্থান সৃষ্টির একমাত্র পথ। সরকারি বিনিয়োগ সব সময়ই 'কৌশলগত'। এটা সরাসরি কর্মসংস্থানে তেমন একটা ভূমিকা না রাখলেও বেসরকারি খাতকে বিনিয়োগে উৎসাহ যোগায়। অথচ বিগত ৫ বছর ধরে ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগ জিডিপি'র ২২-২৩ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। ফলে কর্মসংস্থানের ওপরে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তাছাড়া যে ধরণের কর্মসংস্থান ঘটছে তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। দেশের ৮৫.১ শতাংশ কর্মসংস্থান ঘটছে অনানুষ্ঠানিক খাতে যেখানে বেতন-ভাতা, কর্মঘণ্টা, কাজের নিশ্চয়তা, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি প্রশ্ন সাপেক্ষ।

অর্থনৈতিক অগ্রগতি বনাম শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার চ্যালেঞ্জ

বিগত ৫ বছর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হার ৭ শতাংশের ওপরে অবস্থান করছে। সরকারি হিসেবে চলতি অর্থবছরে (২০১৮-১৯) এটা ৮ শতাংশ অতিক্রম করবে বলে আভাস দেয়া হয়েছে। এই অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে রয়েছে মধ্যম হারের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি, আয় বণ্টনে অসমতা, শ্রমশক্তির উল্যেখযোগ্য অংশের বেকারত্ব, জ্বালানী, খাদ্যশস্য এবং মূলধনী যন্ত্রপাতির জন্য আমদানী নির্ভরতা, জাতীয় সঞ্চয়ের নিম্নহার, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর ক্রমহ্রাসমান নির্ভরতা এবং কৃষি খাতের সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে সেবাখাতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি।

অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের সার্বিক প্রবৃদ্ধিতে মূল ভূমিকা রেখেছে এদেশের কৃষক, পোষাক ও প্রবাসী শ্রমিক।

সারণি:১জিডিপি'তে খাতভিত্তিক অবদান ও শ্রম নিয়োজন

খাত	জিডিপি (%)	কর্মসংস্থান (%)
কৃষি	১৩.৩১	৪০.৬
শিল্প	৩১.৩১	২০.৪
সেবা	৫৫.৩৮	৩৯.০

সূত্র: বিবিএস (২০১৯) এবং শ্রমশক্তি জরিপ (২০১৬-১৭)

সারণি- ১ থেকে দেখা যায়, সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ কৃষিতে (৪০.৬%) নিয়োজিত আছে। এর পরেই আছে সেবাখাত (৩৯.০%)। তবে এই উপাত্ত থেকে বাংলাদেশে শ্রমজীবী মানুষের কর্মসংস্থানের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে তেমন কিছু ধারণা করা যায় না। তবে মনে রাখা দরকার, কৃষি ও শিল্প আনুপাতিকভাবে অনেক বেশি শ্রমঘন। কিন্তু যে বিষয়টি সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, বাংলাদেশের মোট কর্মসংস্থানের ৮৫.১ শতাংশই 'অনানুষ্ঠানিক' খাতের, মাত্র ১৪.৯ শতাংশ 'আনুষ্ঠানিক' খাতের।

অনুষ্ঠানিক খাতে কাজের নিরাপত্তা, কর্মপরিবেশ, মজুরি, উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি খুবই নিম্ন। প্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিক মূলতঃ সরকারি বেসরকারি খাতে বিভিন্ন সংস্থায় নিয়মিত শ্রম দিচ্ছেন যার মধ্যে রয়েছে পাট, টেক্সটাইল, গার্মেন্টস, চিনি, কাগজ, ট্যানারি, পরিবহণ ও চা। অন্যদিকে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকরা মূলতঃ গৃহকর্ম, নির্মাণ, কৃষি, হকার প্রভৃতি কাজে নিয়োজিত। এসব অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে বিদ্যমান শ্রম আইনের প্রয়োগ কঠিন। গড় মজুরিতে এশিয়ার অন্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ।

দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসব খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য। খাতওয়ারি জিডিপি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান সর্বাধিক ৩১.৩১ শতাংশ, কৃষিখাতের অবদান ১৩.৩১ শতাংশ এবং সেবা খাতের অবদান ৫৫.৩৮ শতাংশ।

বাংলাদেশ সরকার শ্রমজীবী মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন, উৎপাদনশীল ও 'শোভন কর্মসুযোগ' সৃষ্টি, শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার সুরক্ষাসহ নানা ধরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার (বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ) ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থান বিষয়ে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করার পাশাপাশি শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বৈশ্বিক উন্নয়নের একটি নতুন এজেন্ডা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের ভিত্তি বছর ২০১৬। শ্রমিকদের অনেক দিনের দাবি 'শোভন কাজ' টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৮ নং লক্ষ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে 'সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে হাজির করা হয়েছে।

বাজেট বরাদ্দের ধারা: শ্রম ও কর্মসংস্থান খাত

জাতীয় বাজেটে 'শ্রম ও কর্মসংস্থান খাত' শিরোনামে নামে কোন বিশেষ খাত নেই যেখানে শ্রম, শ্রমিক (সেবা, শিল্প, কৃষিসহ সকল খাতের), কর্মসংস্থান, শ্রম অধিকার, শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ও বাজেট বরাদ্দ করা হয়। তবে 'শ্রম ও কর্মসংস্থান' খাত নামে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিপি) একটি বিশেষ খাত রয়েছে যেখানে মূলত: শিল্প এবং বিশেষভাবে নগরকেন্দ্রীক নানা ধরণের পেশায় নিয়োজিত শ্রমিকদের অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য নানা ধরণের 'প্রকল্প' হাতে নেয়া হয়। এসব প্রকল্পের বেশিরভাগই দু'টি বিশেষ মন্ত্রণালয়- ১. শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও ২. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়'র অধীন। এসব বিবেচনায় শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ ও নীতি নির্ধারকরা সাধারণত: এ দু'টি মন্ত্রণালয়কেই শ্রম, শ্রমিক ও কর্মসংস্থান বিষয়ক মূল মন্ত্রণালয় হিসেবে গণ্য করে থাকেন। কিন্তু আমাদের মনে রাখা দরকার যে, শিল্প এবং নির্মাণখাতের বাইরে বিদ্যমান বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষের চাহিদা পূরণ কিংবা সুযোগ-সুবিধার বৃদ্ধির সাথে এ দু'মন্ত্রণালয়ের সরাসরি কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রমজীবীদের স্বার্থের দিক থেকে বাজেটের বিগত বছরগুলোর অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। জাতীয় বাজেটে শ্রম ও কর্মসংস্থান অত্যন্ত অবহেলিত ও উপেক্ষিত। সামগ্রিকভাবে জাতীয় বাজেটের আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রতিবছরই এ দু' মন্ত্রণালয়ের বাজেট বাড়লেও উন্নয়ন বরাদ্দের দিক দিয়ে তা শ্রমজীবী মানুষের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুলই থাকছে। বিশেষ করে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের দিকে দৃষ্টি দিলে এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আলোচ্য দু'টি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট বরাদ্দ ৮২২ কোটি টাকা- শ্রম ও কর্মসংস্থান ২২৭ কোটি এবং প্রবাসী কল্যাণ ৫৯৫ কোটি টাকা। বিগত ৫ বছরে বাজেটের আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ দু মন্ত্রণালয়ের বাজেটও বেড়েছে ধারাবাহিকভাবে (চিত্র ২ ও ৩)।

চিত্র- ২ বাজেট (২০১৫-১৯): শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

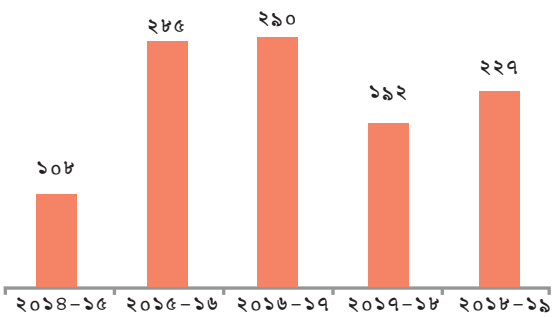

চিত্র– ৩ বাজেট (২০১৫–১৯):
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

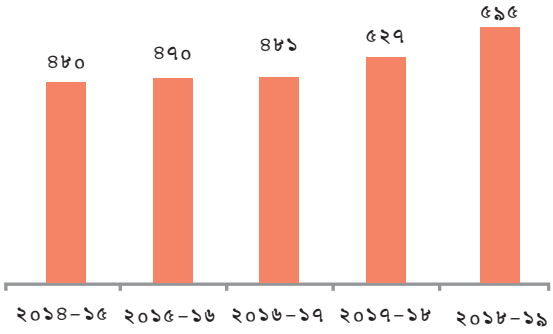

চলতি অর্থবছরে (২০১৮–১৯) প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ৮টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মধ্যে ৫টি প্রকল্পই কোন না কোনভাবে বিভিন্ন ধরণের কারিগরী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামো উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিকায়নের সাথে সম্পর্কিত। তবে এটা লক্ষণীয় যে, বিদেশে চাকরিতে আগ্রহীদের জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রচুর বিনিয়োগ হচ্ছে। কিন্তু প্রশাসনিক ও প্রকল্পের ধরণের দিক দিয়ে এর বেশিরভাগই শিক্ষামন্ত্রণালয় ও যুব উন্নয়ন সম্পর্কিত বলে ধারণা করা যেতে পারে। ফলে এসব প্রকল্প কেন এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেয়া হচ্ছে সে প্রশ্ন তোলাই যায়। দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও যুব উন্নয়নের বিভিন্ন কোর্স/ট্রেড গুলির সাথে এর সামঞ্জস্য বিধান করলে হয়তো আলাদা ভাবে এগুলির জন্য বরাদ্দ প্রয়োজন হতো না। হয়তো অর্থের সাশ্রয় হতো।

অন্য দিকে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে যার অধিকাংশই অবকাঠামোগত উন্নয়ন সম্পর্কিত, ৩টি প্রকল্পসচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত GGKs একটি প্রকল্পের অধীনে শ্রমিকদের জন্য কিছুটা স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সাথে সম্পর্কিত।

বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর বেশিরভাগই অবকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত। অন্যদিকে শ্রম মন্ত্রণালয়ের বেশিরভাগ প্রকল্প পোশাক খাতকে কেন্দ্র করে। ফলশ্রুতিতে অন্যান্য ৪১টি আনুষ্ঠানিক খাত সমানভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না। যেহেতু বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির সুবিধা জনগণ তথা শ্রমিকগোষ্ঠি সরাসরি পান তাই এখানে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক এডিপি বিশ্লেষণ জরুরি।

কিন্তু লক্ষ্যণীয় যে, শহরাঞ্চলের শিল্প বা নির্মাণ খাতের শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের চাহিদা যেমন স্বাস্থ্য, কম খরচে আবাসিক সুবিধা, শিল্প এলাকায় শিশু যত্নকেন্দ্র স্থাপন, রেশন সুবিধা ইত্যাদি বিষয়গুলির সাথে এসব বড় বড় প্রকল্পের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ বিগত কয়েক বছর ধরে শ্রমজীবী মানুষ ও শ্রমিক আন্দোলনগুলির সামনে মজুরি বাড়ানোর পাশাপাশি এগুলিই ছিল মূল দাবি। বাজেটে এসব দাবি কার্যত: উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে।

চিত্র– ৪ বাজেট (২০১৫–১৯):
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (কোটি টাকা)

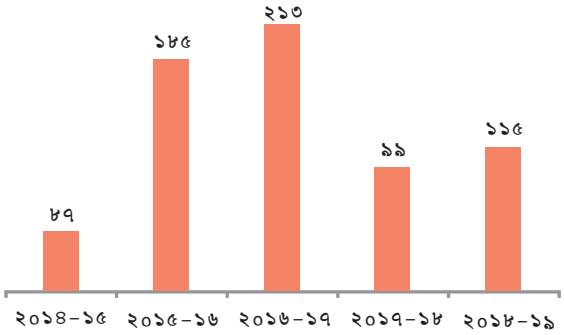

চিত্র– ৫ উন্নয়ন বরাদ্দ: প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (কোটি টাকা)

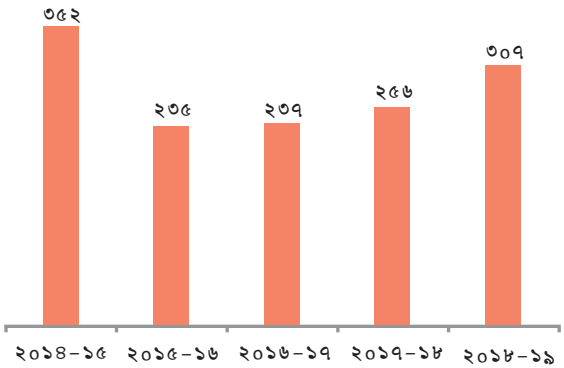

যদিও এ দু'টি মন্ত্রণালয় শ্রমিকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে তথাপি অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে শ্রমজীবী মানুষের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে শিল্প মন্ত্রণালয়, নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে যা শ্রম ইস্যুর সাথে কোন না কোনভাবে সম্পর্কিত। তবে এসকল প্রকল্পের বেশিরভাগেরই উদ্দেশ্য কর্মসৃজন বা দক্ষতা উন্নয়ন করা।

এছাড়া ২০১৮–১৯ অর্থ বছরের বাজেট বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে চলমান সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতায় কমপক্ষে ১৫টি প্রকল্প রয়েছে যা শ্রম ইস্যু বা শ্রমিক সংক্রান্ত। দু–একটি প্রকল্প যেমন– চা শ্রমিক জীবনমান উন্নয়ন, ইম্প্রুভিং ওয়ার্কিং কন্ডিশন ইন রেডিমেট গার্মেন্টস, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা প্রকল্প ছাড়া বাকী সব প্রকল্প কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত।

প্রস্তাবনা

- সকল শ্রমিকের নিম্নতম মজুরির নির্ধারণ করা দরকার। পে-স্কেল, জিডিপি, মাথাপিঁছু আয় সুবিবেচনা নিয়ে নিম্নতম মজুরি ১৮ হাজার টাকা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।
- শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সেক্টর ও কারখানাভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে (ক) প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, (খ) জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা এবং (গ) গবেষণা কার্য পরিচালনায় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বেশি। প্রচুর নারী শ্রমিক গণপরিবহনে প্রতিদিন যাতায়াত করে। নারীর নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে সচেতনতা বাড়াতে হবে। গণপরিবহনে নারীর নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিতকরণে বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন।
- কর্মক্ষেত্র দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা, পূনর্বাসন ও সামগ্রিক সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক খাতের জন্য একটি 'কেন্দ্রীয় এমপ্লয়মেন্ট ইনজুরি স্কীম' চালু করা দরকার।
- শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য স্থায়ী মানদন্ড তৈরি এবং তা কার্যকর করা। দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে (লস অব ইয়ার আরনিং) মৃত্যুর সময় থেকে চাকরির মেয়াদকাল পর্যন্ত ইনক্রিমেন্ট, মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারণ করে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থাপনার জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা দরকার। শ্রমিকের যথাযথ ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও আদায়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও তা কার্যকর করা আশুপ্রয়োজন।
- শ্রমিকদের জন্য রেশনিং/ন্যায্য মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয়ের সুবিধা এবং বেসরকারি খাতের শ্রমিকের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজেট সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা।
- শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন করা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা। মালিক কর্তৃক শ্রমিকের স্বাস্থ্য-বীমা চালু করা প্রয়োজন।
- শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন ভাতা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিতে বাজেটে বরাদ্দ রাখা।
- শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রসমূহকে কার্যকর করা ও সেবার মান বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা এবং নিয়মিত মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা।
- প্রবাসে কর্মরত শ্রমিকদের সকল ধরণের 'অধিকার' নিশ্চিত করার জন্য প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়সহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আরো বেশি তৎপর হতে হবে। নারী শ্রমিক প্রেরণের ক্ষেত্রে আরো সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাসে বিশেষ মনিটিরিং সেল গঠন করা যেতে পারে।
- বিদেশে দক্ষ শ্রমিক প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে।

স্থানীয় সরকারমুখী ও অংশগ্রহণমূলক ‘জেন্ডার বাজেট’ চাই

বর্তমান বিশ্বে নারীর ক্ষমতায়নকে আর্থসামাজিক উন্নয়নের সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নারীর ক্ষমতায়ন কিংবা নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার জন্য অপরিহার্য নিয়ামক হচ্ছে, নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নারীরা যেহেতু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিবিধ সুবিধাবঞ্চিত, সেহেতু সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের একীভূত করার জন্য প্রয়োজন আলাদা আর্থিক বরাদ্দ।

জেন্ডার বাজেট মানে হলো নারী ও পুরুষের মধ্যে যে ফারাক আছে, তা চিহ্নিত করা। কিন্তু নারীরা পিছিয়ে আছে বলে নারীর বিষয়টি বেশি আলোচিত হয়। জেন্ডার বাজেট কিন্তু নারীর জন্য আলাদা কোনো বাজেট নয়, বরং এটি একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশের সাহায্য জাতীয় বাজেটের জেন্ডার-সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করা যায়। জেন্ডার বাজেটের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের জেন্ডার সংবেদনশীলতা চিহ্নিত করে বাজেটে সম্পদের যথাযথ বণ্টনের মাধ্যমে নারী-পুরুষের সমতা বৃদ্ধি বা অসমতা হ্রাস করা।

জেন্ডার বাজেট শুধু টাকার হিসাব নয়। এ বাজেটের মূল উদ্দেশ্য জেন্ডার বা লৈঙ্গিক সমতার বিষয়টিকে রাষ্ট্রের সব ধরনের কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা। বাজেটে এমনভাবে বরাদ্দ প্রদান করা, যাতে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য দূর করা সম্ভব হয়।

জাতীয় বাজেটে নারীর হিস্যা

জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে ২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে শুরু হয়। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে সরকার জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে ৪৩টি মন্ত্রণালয়কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং ৩ টি গুচ্ছে ভাগ করে প্রতিবেদন তৈরি করে-

১. নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি কৌশলের অধিনে রয়েছে ৯ টি মন্ত্রণালয়;

২. উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কাজে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিত কৌশলের অধীনে আছে ৯টি মন্ত্রণালয়; এবং

৩. সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে নারীর সুযোগ বৃদ্ধি করার কৌশলের অধিনে রয়েছে ২৫ টি মন্ত্রণালয়।

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা যায় যে, গতবছরের প্রস্তাবিত ও সংশোধিত বাজেটের তুলনায় এ বছরের প্রস্তাবিত বাজেটে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট উভয়ক্ষেত্রে নারীর হিস্যা টাকার অংকে ও তার শতকরা হারেও বেড়েছে।

সারণী ১: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ে নারীর জন্য বরাদ্দ বাজেট (কোটি টাকায়)

বিবরণ	২০১৮-১৯ (প্রস্তাবিত বাজেট)	২০১৭-১৮ (প্রস্তাবিত বাজেট)	২০১৬-১৭ (সংশোধিত বাজেট)	২০১৬-১৭ (প্রস্তাবিত বাজেট)	২০১৫-১৬ (সংশোধিত বাজেট)	২০১৫-১৬ (প্রস্তাবিত বাজেট)
মোট বাজেট	৪৬৪৫৭৪	৪০০২৬৬	৩১৭১৭৪	৩৪০৬০৫	২৬৪৫৬৫	২৯৫১০০
মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দে নারীর হিস্যা	২৭৭৬	২০৭৪	১৭১৯	১৬৫৬	১৩৬৮	১৩৭৯
উন্নয়ন বাজেটে নারীর হিস্যা	৪৮৮	২৪২	১৪৪	১১৬	৯৭	১৩২
অনুন্নয়ন বাজেটে নারীর হিস্যা	২২৮৮	১৮৫৩	১৫৭৬	১৫৪০	১২৭১	১৫২৯

[১] Gender Budgeting Report 2018-19. Retrieved from: http://mof.gov.bd/en/

সারণী ২-এ দেখা যাচ্ছে, বিগত পাঁচ বছরে মোট বাজেটের তুলনায় এবং জিডিপি'র হিসাবে নারী উন্নয়নে বরাদ্দের শতকরা হার প্রায় একই রয়েছে, যথাক্রমে ২৯% ও ৫% এর বেশি; যা চাহিদার তুলনায় অপর্যাপ্ত।

সারণী ২: গত ৫ অর্থবছরে মোট বাজেটের তুলনায় নারী উন্নয়নে বরাদ্দের শতকরা হার (%)

অর্থবছর	মোট বাজেটের তুলনায় নারী উন্নয়নে বরাদ্দের শতকরা হার (%)	জিডিপির শতকরা হার (%)
২০১৩-১৪	২৭.৬৪	৫.০৬
২০১৪-১৫	২৭.৭৪	৪.২৩
২০১৫-১৬	২৭.১৭	৪.১৬
২০১৬-১৭	২৭.২৫	৪.৭৩
২০১৭-১৮	২৭.৯৯	৫.০৪
২০১৮-১৯	২৯.৪৮	৫.৪৩

সূত্র: জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদন ২০১৮-১৯

বিগত বছরগুলোর বাজেট পর্যালোচনায় দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে নারী উন্নয়নে বরাদ্দ দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে। যেখানে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জেন্ডার বাজেটে বরাদ্দ ধরা হয়েছিল ৫৯ হাজার ৭৫৬ কোটি টাকা। সে তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ বেড়েছে ৭৭ হাজার ৯৮৬ কোটি টাকা।

বাজেটে বরাদ্দ বাড়লেও যে প্রক্রিয়ায় জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হচ্ছে তা মোটেও নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হচ্ছে না। অথচ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা (এসডিজি'র) ৫ নম্বর লক্ষ্য হচ্ছে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারীর ক্ষমতায়ন এবং এই লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সরকার বদ্ধপরিকর।

সরকার জেন্ডারবান্ধব বাজেট করলেও বাস্তব অগ্রগতি নিয়ে কোনো তথ্য নেই। নজরদারির অভাবে বাজেট বরাদ্দের কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে, নারীর জীবনে কোন কোন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো, তার কোনো তথ্য নেই। জেন্ডার বাজেট নিয়েও ধারণাগত অস্পষ্টতা রয়েছে।

সরকারি জনসেবায় দরিদ্র নারীদের প্রবেশগম্যতাকে তাদের উন্নয়নের একটি ধাপ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জনসেবার পরিকল্পনা এবং বিতরণ পর্যায়ে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণ খুবই সীমিত, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। সবকিছু বিবেচনা করে নারীদের কার্যকরী অংশগ্রহণের মাধ্যমে জেন্ডার বাজেট প্রণয়নের দাবি গত কয়েক বছর ধরেই উচ্চারিত হচ্ছে। জেন্ডারকে মূল ধারায় আনতে সরকারের নানামুখী উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও কর্মকর্তাদের অদক্ষতার কারণে জেন্ডার বাজেট বাস্তবায়নে সমস্যা হচ্ছে।

নারী ও পুরুষের মধ্যে অসমতা দূর ও নারীর ক্ষমতায়নকে নিশ্চিত করতে হলে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরতে চাই।

প্রস্তাবনা

- **সংখ্যাতাত্ত্বিকের পাশাপাশি গুণগত বিশ্লেষণ:** বাজেট বিশ্লেষণের যে ৩টি স্বীকৃত পদ্ধতি রয়েছে তার সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষনের পাশাপাশি গুণগত বিশ্লেষণ করার জন্য পরিমাপক নির্ধারণ করা উচিত। বিশেষত জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বরাদ্দ দেখানোর পাশাপাশি সেই বরাদ্দকৃত বাজেট আসলে নারীর কোন স্ট্র্যাটেজিক জেন্ডার চাহিদা পূরণ করছে এবং তার অগ্রগতি কতটুকু হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ থাকতে হবে।

- **নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণে জেন্ডার বাজেটিং:** নারীর পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে স্থানীয় সরকার পর্যায় থেকেই। জেন্ডার বাজেটিং প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ শুধু কাগজে-কলমে ও সংখ্যায় নয়, বরং সক্রিয়ভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

- **নারী-সহায়ক প্রকল্প বৃদ্ধি:** কেবলমাত্র সেফটি নেট প্রকল্প কিংবা ক্ষুদ্রঋণ ভিত্তিক কর্মসূচিতে নারীর উন্নয়ন সীমাবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর নারী সমাজের ক্ষমতায়ন ও জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ সহায়ক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- **স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন:** স্থানীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে নারীদের সমস্যা চিহ্নিত করে সেসব সমস্যা সমাধানে ও অর্থনৈতিক

ক্ষমতায়নে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে আলাদা জেন্ডার বাজেট প্রণয়ন করা।

- **নারীর মতামত গ্রহণ:** নারী লক্ষীভূত উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নির্বাচনে এবং প্রণয়নে নারীর মতামতকে প্রাধান্য দিতে হবে এবং নারীর প্রয়োজন সঠিকভাবে নির্ণয় করে নারী লক্ষীভূত প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

- **নারীদের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগ:** নারীর জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটীয় অর্থের দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং দক্ষ বা বাস্তবায়নের জন্য নারী লক্ষীভূত প্রকল্প এবং জেন্ডার সংবেদনশীল প্রকল্পগুলোর পরিচালক হিসাবে নারীকে নিয়োগ দিতে হবে।

- **মনিটরিং ও অডিটিং:** জেন্ডার বাজেট বাস্তবায়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও এনজিও এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদেও সমন্বয়ে মনিটরিং সেল গঠন করা দরকার। এই সেলের কাজ হবে জেন্ডার বাজেটিং এ প্রতি কর্মসূচির জন্য মনিটরিং এবং বড় প্রজেক্টের জন্য অডিটিং এর ব্যবস্থা করা।

- **গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো:** জেন্ডারভিত্তিক/নারী-পুরুষ ভেদে আলাদা তথ্য/উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে আরও কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। সরকারি পরিসংখ্যানে নারীর অমূল্যায়িত শ্রমকে অন্তর্ভুক্তি করার লক্ষ্যে বিআইডিএস, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ইত্যাদি সংগঠনে সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে এবং এ জন্য বাজেটের বরাদ্দ বাড়াতে হবে।

- **জেলাভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া কার্যকর করা:** জেলাভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া কার্যকর করতে হবে। সেখানে স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক নারীদের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। মাতৃস্বাস্থ্যের ভাতার পরিধি ও পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রত্যন্ত এলাকার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিক তৈরির উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

- **মন্ত্রণালয়ভিত্তিক জেন্ডার বাজেট সেল গঠন:** এখন প্রায় সব মন্ত্রণালয়ে নারীদের জন্য আলাদা বরাদ্দ রাখা হচ্ছে। কিন্তু ফল সেভাবে আসছে না। এর কারণ কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব। অনেক দেশে মন্ত্রণালয়গুলোতে নারী বাজেট সেল রয়েছে। সেরকম আমাদের দেশের মন্ত্রণালয়গুলোতেও যদি থাকত তাহলে কাজগুলো আরও গোছানো হতো এবং নারীরা আরও উপকৃত হতো। এই সেলগুলোর দায়িত্বই হতো জেন্ডার বাজেটিংয়ে নারীর চাহিদাগুলোকে সঠিকভাবে নিরূপণ করে চিহ্নিত করা। যার প্রতিফলন বাজেট বরাদ্দতে আসতে পারে–এই পুরো প্রক্রিয়াটির দায়িত্বে এই সেল থাকতে পারে। বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ ভাবে খরচ হচ্ছে কি-না বাস্তবায়ন পর্যায়ে তা মনিটর করা এবং অর্থবছর শেষে কতটুকু চাহিদা পূরণ হলো তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাতে এর প্রতিফলন পরবর্তী বাজেটে আসতে পারে।

জাতীয় বাজেট হোক দলিতবান্ধব

ভূমিকা

আভিধানিকভাবে দলিত বলতে বুঝায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে, যারা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর এবং সমাজের কাছেও প্রতিনিয়ত অবহেলিত ও অস্পৃশ্য। বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর মোট সংখ্যা কত এ ব্যাপারে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই; দেশে প্রায় ৬৫ লক্ষ দলিত জনগোষ্ঠীর বসবাস। এদের প্রায় অধিকাংশই ভূমিহীন। অনেক জায়গায় স্থানীয় সেলুন, চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করতে পারে না; এমনকি মন্দির, অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয় ও সামাজিক আচারঅনুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার নেই তাদের। দলিত পরিচয়ে শিশুরা পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষার্থীদের কাছে হয়ে থাকে বৈষম্যের শিকার। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করার ফলে প্রায়ই বিভিন্ন রোগব্যাধিতে ভুগে বহু মানুষ। আবার সরকারি বিভিন্ন স্বাস্থ্যসেবা ও কমিউনিটি ক্লিনিকেও তাদের অস্পৃশ্যতার শিকার হতে হয়। উপরন্তু চরম দরিদ্রতার কারণে চিকিৎসা নিতে পারে না অনেকেই। এদেশের সংবিধানে যেখানে সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা ও অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে, সেখানে প্রতিনিয়ত সেই অধিকার ও মানবিক মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এদেশেরই একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী।

অনগ্রসর এই দলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে তাই প্রয়োজন যথোপযুক্ত বাজেট বরাদ্দ। যদিও প্রতি বছর আমাদের জাতীয় বাজেটে দলিত ও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য বরাদ্দ রয়েছে, কিন্তু সেই বাজেট প্রণয়নে দলিত জনগোষ্ঠীর কোনো অংশগ্রহণ থাকে না। তাছাড়া বাজেট বরাদ্দের সময় এই জনগোষ্ঠীকে অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন, বেদে ও হিজরা জনগোষ্ঠীর সাথে একত্রিত করে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়। ফলে দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রকৃত বরাদ্দ নিরুপন করা যায় না।

তবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) এবং ক্ষমতাসীন দলের নির্বাচনী অঙ্গীকারে দলিত সম্প্রদায়ের বিষয়ে গুরুত্বের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে এ অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি প্রতিফলিত হয়নি।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও দলিত জনগোষ্ঠী

সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উল্লেখ রয়েছে, "ধোপা, মুচি, নাপিত ও অনুরূপ অন্যান্য সনাতনী নিম্নবর্ণের মানুষজনের মতো সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি বিষয়ে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় এই সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ধারার সাথে যুক্ত করার বিভিন্ন কৌশল অনুসরণের মাধ্যমে তাদের অধিকার সুরক্ষার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। এই প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে সরকার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও সেই সাথে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। সামাজিক বৈষম্য থেকে তাদের সুরক্ষা দিতে আইনগত বিধান তৈরি করা হয়। তবে জনপ্রশাসনের সামর্থ্যে ঘাটতি ও শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি সরকারি নীতির সঠিক বাস্তবায়নকে নানাভাবে বিঘ্নিত করে। তাই সপ্তম পরিকল্পনায় জনপ্রশাসন ও স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করার ওপর বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।"(সূত্র: ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ২০১৫/১৬-২০১৯/২০, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল ও দলিত জনগোষ্ঠী

বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-২০১৫ তে দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে। জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল-২০১৫ এর ২.৮ অনুচ্ছেদ (অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা) এর ২.৮.২ ধারায় উল্লেখ আছে, "অন্যান্যদের ন্যায় দলিত পরিবারগুলোরও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি থেকে উপকার লাভের সমান সুযোগ রয়েছে। অধিকন্তু, দলিতদের জন্য জেলা শহরে সুইপার কলোনী নির্মাণ নামক একটি বিশেষ কর্মসূচি রয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে এ খাতে ১০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া

হয়।" (সূত্র: জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশ- জুলাই, ২০১৫, পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার)

এসডিজি'র আলোকে দলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের নীতিমালা

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)- এর মূলমন্ত্র হচ্ছে কাউকে পিছনে রাখা যাবে না। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য বাংলাদেশে যেখানে বিস্তৃত পরিসরে কর্মসূচি বাস্তবায়ন হচ্ছে, সেখানে দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী তথা দলিত জনগোষ্ঠীকে পিছিয়ে রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা তথা এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা কখনোই সম্ভব নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়েছে এসডিজি'র বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য। শুধু তাই নয়, সরকার দেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) এসডিজি'র কতিপয় লক্ষ্যকে সংযুক্ত করেছে। এসডিজি'র আলোকে দলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিভিন্ন সুপারিশমালা তুলে ধরা হলো:

অভীষ্ট	সুপারিশ
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: ১ সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্রের অবসান	• দলিত জনগোষ্ঠীকে বিশেষ কমিউনিটি হিসেবে চিহ্নিত করে মাথাপিছু দারিদ্র অবস্থাসহ (head-count poverty status) এ জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আলাদা তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। • অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর অধীনে না রেখে দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য জাতীয় বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ প্রদান করতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দলিত নারী ও পুরুষের জন্য দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের আওতা বৃদ্ধি এবং এই কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। • দলিতদের ঐতিহ্যবাহী পেশায় চাকুরির নিশ্চয়তা নিশ্চিতসহ মর্যাদাকর পেশায় উত্তরণ নিশ্চিত করাসহ চাকুরিক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করতে হবে। • চা বাগানের শ্রমিকদের মানসম্মত মজুরি ও সামাজিক নিরাপত্তা সহায়তা নিশ্চিত করতে হবে। • খাসজমি বরাদ্দে দলিতদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: ৩ সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ	• দলিত জনগোষ্ঠীর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসমস্যাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে পুষ্টি ও স্বাস্থ্যনীতিতে এ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিশেষ প্রবিধান অন্তর্ভুক্ত করা • দলিত জনগোষ্ঠী ও চা শ্রমিকদের জন্য বিশেষায়িত স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবাকেন্দ্র স্থাপন, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ও চা শ্রমিকদের আধুনিক নিরাপত্তা উপকরণ প্রদান • সনাতন পদ্ধতিতে মনুষ্য বর্জ্য পরিষ্কারকরণ বন্ধ করা
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: ৪ গুনগত শিক্ষা	• প্রাথমিক শিক্ষায় দলিত শিশুদের অংশগ্রহণের হার বৃদ্ধি ও ঝড়ে পড়ার হার রোধ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং শিক্ষা নীতি ও পরিকল্পনায় দলিতদের শিক্ষা উন্নয়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্তকরণ • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দলিত শিক্ষার্থীদের প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য অবসানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক উদ্যোগ গ্রহণ • দলিতদের মধ্যে শিক্ষার হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: ৫ জেন্ডার সমতা	• দলিত মেয়েদের বাল্য বিয়ের হার প্রতিরোধ করে তাদের শিক্ষা নিশ্চিত করা • দলিত কমিউনিটির পঞ্চায়েতে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা • দলিত নারীদের প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যায়বিচার নিশ্চিতসহ পুরুষ ও নারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ • দলিত নারীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দক্ষতা ও আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: ৮ শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি	• দলিতদের প্রথাগত কাজে নিশ্চয়তার পাশাপাশি বিকল্প ও মর্যাদাকর পেশায় উত্তরণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ • চা শ্রমিকদের জন্য জীবন যাপনের উপযোগী বেতন কাঠামো ও চাকুরির নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে। • জলাভূমি তথা বিল, বাওড় ও হাওড়ের বরাদ্দ প্রকৃত মৎস্যজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। • শিক্ষিত দলিতদের জন্য সরকারি চাকুরিতে বিশেষ কোটা প্রদান করতে হবে।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার এবং দলিত সম্প্রদায়

সর্বপ্রথম ২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে দলিত শব্দটি ব্যবহার করে। সেখানে দলিত উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু কর্মসূচির ঘোষণা দেয়া হয়। সমাজের সুবিধাবঞ্চিত এই সম্প্রদায়টি আন্তর্জাতিক পরিসরে দলিত হিসেবে বহু আগে থেকেই স্বীকৃত হলেও আমাদের দেশে ২০০৮ সাল থেকেই মূলত দলিত শব্দটি পরিচিতি লাভ করে। তখন থেকেই দলিত উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

'.....সংখ্যালঘু, আদিবাসী, ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠী এবং **দলিতদের প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে**। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকুরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।' - নির্বাচনী ইশতেহার, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০০৮ (অনুচ্ছেদ ১৮.১)

বিভিন্ন সরকারি নীতিমালাসমূহে দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের অঙ্গীকারের উল্লেখ থাকায় আমরা সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই । আমাদের প্রত্যাশা থাকবে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে এর সঠিক প্রতিফলিত থাকবে।

জাতীয় বাজেটে দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য সীমিত বরাদ্দ

জাতীয় বাজেটে সমাজসেবা অধিদপ্তর-এর আওতায় 'বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির' বরাদ্দ বিবরণ নিম্নরূপ:

অর্থ বছর	জেলা	বরাদ্ধকৃত অর্থ
২০১২-১৩	৭ জেলা	৬৬,০০,০০০ (ছিষট্টি লক্ষ টাকা)
২০১৩-১৪	২১ জেলা	৭,৯৬,৯৮,০০০ (সাত কোটি ছিয়ানববই লক্ষ আটানববই হাজার টাকা)
২০১৪-১৫	২১ জেলা	৯,২২,৯৪,০০০ টাকা (নয় কোটি, বাইশ লক্ষ, চুরানব্বই হাজার টাকা)
২০১৫-১৬	৬৪ জেলা	১৮,০০,০০,০০০ (আঠার কোটি টাকা)
২০১৬-১৭	৬৪ জেলা	২০,৩০,০০,০০০ (বিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা)
২০১৭-১৮	৬৪ জেলা	২৭,০০,০০,০০০ (সাতাশ কোটি টাকা)
২০১৮-১৯	৬৪ জেলা	৫০,০৩,০০,০০০ (পঞ্চাশ কোটি তিন লক্ষ টাকা)

*তথ্যসুত্র: সমাজসেবা অধিদপ্তর-এর ওয়েবসাইট

বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য নিজস্ব কর্মসূচি ভিত্তিক বাজেট

সরকার কর্তৃক দলিত উন্নয়নে যেসব কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে জাতীয় বাজেটে নিরাপত্তা খাতে সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ প্রদান অন্যতম প্রধান। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক দলিত, হরিজন, বেদে উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়েছে এবং বরাদ্দকৃত প্রকল্প প্রায় ৪১ টি জেলায় শিক্ষাবৃত্তি, যুব প্রশিক্ষণ ও বয়স্কভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২৯ মে, ২০১২ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের দলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে একটি নির্দেশনা প্রদান করেন। দলিত শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ ভর্তি কোটা এবং হরিজনদের পরিচ্ছন্নতা কর্মীর চাকরিতে ৮০% কোটা বরাদ্দ করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে স্পেশাল এরিয়া ফর ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পাশাপাশি দলিতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দলিত জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ে নিজস্ব কর্মসূচিভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ হয়েছে। যেমন, শহরাঞ্চলের দলিত জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০০৫ সালে বাংলাদেশ সরকার ঢাকা সিটি করপোরেশনের অধীন ধলপুর, সূত্রাপুর এবং দয়াগঞ্জে সুইপার কলোণী নির্মাণের জন্য ঢাকা সিটি করপোরেশনকে ২০ কোটি ৯৩ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়। দলিত আবাসনের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কয়েকজন দুর্নীতির ফলে ঐ আবাসন প্রকল্পটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। (সূত্র: দৈনিক সমকাল, ১২ এপ্রিল, ২০১২)।

পরবর্তীতে জাতীয় বাজেটের আবাসন খাতে দলিত, বেদে ও হিজড়া জনগোষ্ঠীর আবাসন ব্যবস্থার উন্নয়নে ২০১১-১২ অর্থবছরে ১০ কোটি টাকা, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ১৪ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উল্লেখিত জনগোষ্ঠীর আবাসন খাতে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখা হয়। সে অনুযায়ী ইতিমধ্যে ঢাকা শহরের বিভিন্ন কলোনিতে কিছু বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং কিছু ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়াও গত ১ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় সরকার কনস্ট্রাকশন অব ক্লিনার কলোনি অব ঢাকা সিটি করপোরেশন এর প্রকল্পের আওতায় ঢাকা সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য ১ হাজার ১৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যার জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১৯০ কোটি টাকা। বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ঢাকা শহরের কলোনিগুলোতে বসবাসরত দলিত জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্য সমাধানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইতিমধ্যে বেশ কিছু ভবন নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে। সূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ২ অক্টোবর ২০১৩ (একনেক-এর সিদ্ধান্ত)। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন ১,৭৭৩,০০০,০০০ (একশত সাতাত্তর কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা) আবাসন খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরিশাল সিটি করপোরেশনের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২২,০০০,০০০ (বাইশ কোটি টাকা ৬ তলা বিশিষ্ট ৩টি আবাসন ভবন নির্মানের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় প্রতিটি ভবনে ৪৮টি ফ্লাট আছে। বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী ঢাকা শহরের কলোনিগুলোতে বসবাসরত দলিত জনগোষ্ঠীর আবাসন সমস্য সমাধানে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে বেশ কিছু ভবন নির্মাণ ও হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের জন্য ২৩১ কোটি ৪২ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৪ তলা বিশিষ্ট ৭টি ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। (সূত্র: বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৫ এপ্রিল ২০১৯)

দলিত জনগোষ্ঠীকে স্বীকৃতি প্রদান করে বাজেট বরাদ্দ আবশ্যক

কিন্তু ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে দলিত শব্দটি উল্লেখ না করে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয়, যা দলিত-হরিজন-বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় বরাদ্দকৃত বাজেটে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর নামে যে বাজেট বরাদ্দ আছে, তা বন্টন করা হচ্ছে সমাজের সকল অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে। কেননা, অনগ্রসর শব্দটি বলতে দলিত ছাড়াও মূলধারার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকেও বুঝায়। অর্থাৎ মূলধারার দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে এই খাত থেকেই বন্টন করা হবে। একই সাথে দলিতদের যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো সরকারি স্বীকৃতি নেই, অর্থাৎ তারা তালিকাভুক্ত নয়, কাজেই মূলধারার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকেই দলিত হিসেবে পরিচয় দিয়ে এসব বিশেষ সুবিধা ভোগ করার চেষ্টা চালানোর সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে, দলিতরা বর্তমান বাজেটে পূর্বের তুলনায় অধিক বরাদ্দ পেলেও প্রকৃতপক্ষেই কতখানি সুবিধা ভোগ করতে পারবে সে বিষয়ে যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। কাজেই অতিসত্বর সরকারি নীতিমালা এবং বাজেটে 'দলিত' শব্দটি বহাল রেখে দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ রাখার জন্য সরকারকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

সুপারিশ ও করণীয়

- সংবিধান অনুযায়ী সকল মানুষকে সমান মর্যাদা প্রদান এবং সরকারি সকল নীতিমালায় দলিত ও বঞ্চিত সম্প্রদায়কে স্বীকৃতি প্রদান করতে হবে। দলিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে। বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় দলিত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।
- দলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে সুনির্দিষ্টভাবে বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।
- বাংলাদেশে দলিত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য আদমশুমারীতে পৃথকভাবে চিহ্নিত

করে গণনা করতে হবে। যাতে করে এই জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা যায়। সংখ্যানুপাতের ভিত্তিতে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ দিতে হবে।

- বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম দলিত জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বৃদ্ধিমূলক কাজে সহায়তার জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে।
- প্রকৃত দলিতরাই যাতে বাজেটের বরাদ্দকৃত সুবিধা পায় সে জন্য সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা প্রদান করা এবং একটি মনিটরিং-এর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বিভিন্ন সরকারি সেবায় উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দলিত জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি রাখতে হবে।
- পৌরসভা ও সিটি করপোরেশনে যাদের চাকুরি আছে বা নাই, এটা বিবেচনায় না নিয়ে সকলকে আবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ দলিতদের সবার চাকুরির কোনো নিশ্চয়তা নেই এবং অস্পৃশ্যতা ও নিম্নআয়ের কারণে কলোনীর বাইরে তাদের বাড়ি ভাড়া পাওয়া সম্ভব নয়।
- রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে পরিচ্ছন্নতার কাজে নিয়োজিত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের চাকুরি নিয়মিতকরণ ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধির জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

পর্যালোচনা ও প্রস্তাব
জাতীয় বাজেট ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন-অগ্রগমন

আদিবাসী জনগোষ্ঠী

প্রতি বছর জাতীয় বাজেটের আকার বাড়লেও কাঙ্ক্ষিত সুফল পায় না সমতল ও পাহাড়ের ৫৪টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ। সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশে আদিবাসী আছে প্রায় ১৬ লাখ, বেসরকারি হিসাবে এই সংখ্যা ৩০ লাখেরও বেশি। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নীতি ও উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে এই জনগোষ্ঠী আজও বঞ্চনার শিকার।

'আদিবাসী মানুষ-পাহাড়-সমতল নির্বিশেষে নিরন্তর বঞ্চিত। পার্বত্য হোক আর সমতল হোক-আদিবাসী মানুষেরা মানুষ হিসেবে উন্নয়নের কোন মানদন্ডেই ভাল নেই। জমি-জলা-জঙ্গল-এ আদিবাসী মানুষের মালিকানা বা অভিগম্যতা নেই (সামাজিক, প্রথাগত, ঐতিহ্যগত, গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত)- এ মানদন্ডে আদিবাসী মানুষের হয়েছে আধোগতি। আর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্থানীয় উদ্যেগ, স্থানীয়-শাসন-কোন কিছুতেই তাদের এখন মূলধারায় অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। ১৯৯৭ সালে (০২ ডিসেম্বর) 'শান্তিচুক্তি' খ্যাত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার প্রায় ২০ বছর পরেও এখনও পর্যন্ত পার্বত্য আদিবাসী মানুষের মধ্যে বঞ্চনা-বৈষম্য হ্রাসকারী জনকল্যাণকারী কোন স্থায়ী উন্নয়নের সুলক্ষণ প্রতিভাত হয়নি।'[১] আমরা দেখতে পাই, বাজেটের মধ্যেও সরকারের প্রতিশ্রুতি শুধু প্রতিশ্রুতি হিসেবেই রয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যে নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ৬৫ শতাংশ ও ৪৪ শতাংশ। চরম দারিদ্র্য আদিবাসীদের কাজ খুঁজে পাবার সামর্থ্যও তাই কম, যা তাদের অবস্থাকে আরও করুণ করে তোলে। প্রস্তাবিত বাজেটে তাই আদিবাসী জনগণের জন্যে রাষ্ট্রের এবং সরকারের প্রতিশ্রুতি ও চুক্তিগুলোর আঙ্গিকে বাজেট প্রণয়ন করা উচিত। অপরদিকে আদিবাসীদের পরিচয় সংকট ও সঠিক সংখ্যা নির্ধারণে জটিলতার ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠি বাজেটে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। ২০১১ সালে সরকারি হিসেবে আদিবাসীদের সংখ্যা ১৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ২৩২[২] জন। কিন্তু বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের দাবি, বাংলাদেশে ৩০ লক্ষাধিক আদিবাসী জনগণ বসবাস করেন[৩]।

জাতীয় বাজেটে আদিবাসী জনগোষ্ঠী

জাতীয় বাজেটেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন নেই। বাজেট হলো সরকারের অর্থনৈতিক দলিল। বাজেটের মধ্যদিয়েই সরকারের যাবতীয় নীতি-কর্মসূচি বাস্তবায়নের দিকনির্দেশনা উপস্থাপিত হয়। কিন্তু আমাদের দেশের কেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থায় বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া এখনো প্রশাসননির্ভর। বাজেট ১৬ কোটি মানুষের চাহিদার ক্ষেত্র। কিন্তু বাজেট যারা প্রণয়ন করেন তৃণমূলের মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো যোগাযোগ নেই। এমনকি জনপ্রতিনিধিদের বিষয়টির সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগও খুবই কম। ফলে বাজেটে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সকল মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয় না, তাদের দাবির প্রতিফলনও ঘটে না। আমাদের জাতীয় বাজেটে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর আশা-আকাঙ্ক্ষার তেমন কোনো প্রতিফলন লক্ষ করা যায় না।

আদিবাসীদের জন্য বাজেট বরাদ্দ বলতে আমরা সাধারণত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর আওতায় যে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং সমতলের আদিবাসীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে যে থোক বরাদ্দটুকু দেয়া হয় তাকেই বুঝে থাকি। পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও অন্যান্যদের জন্য কিংবা এ অঞ্চলের অবস্থা পরিবর্তনে জাতীয় বরাদ্দ বাস্তবায়নে রয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়।[৪] আর সমতলের আদিবাসীদের দেখভাল করা ও তাদের উন্নয়নের বাজেট বাস্তবায়নে আজও কোনো মন্ত্রণালয় বা অধিদপ্তর নেই।

---

১ বারাকাত, আবুল। বাংলাদেশের কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি। ২০১৬। মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা। পৃ. ৮-৮২

২ পঞ্চম আদমশুমারি ২০১১

৩ বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম, সংহতি (২০১৬), আদিবাসী শিক্ষা, ভূমি ও জীবনের অধিকার, পৃ.২০

৪ গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন, ২০১৬। জনঅংশীদারিত্বের সন্ধানে, জাতীয় বাজেট (২০১৬-১৭). পৃ.২৬

আদিবাসীদের প্রথাগত ভূমির মালিকানা ও ব্যবহার সম্পর্কে স্বীকৃতি না থাকা; খাসজমিতে বসবাসরত আদিবাসী ও দলিতদের ভূমি অধিকারের বিষয়টির উল্লেখ না থাকা; ২০১৮ সালে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সংস্কারের দাবি অগ্রাহ্য করে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে সকল কোটা রহিতকরণের ফলে 'উপজাতিদের' জন্য ৫% কোটাও বিলীন করে দেওয়া, সমতলের আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও কার্যক্রম উল্লেখ না করা; সমতলের আদিবাসীদের ভূমি অধিকার এবং তাদের অবস্থার উন্নয়নে কোনো পরিকল্পনা প্রণয়নের উল্লেখ না থাকার ফলে আদিবাসীদের আরও প্রান্তিকতার মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩টি জেলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন এবং এই অঞ্চলের জনসাধারণের সাংস্কৃতিক উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের যথাযথ ব্যবস্থাদি গ্রহণের কথা রয়েছে। সর্বশেষ ২০১৮-২০১৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১৩০৯ কোটি টাকা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক বরাদ্দ ২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯ (অংকসমূহ কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	উন্নয়ন খাত	অনুন্নয়ন খাত	মোট বাজেট
২০০৯-১০	১৯৫	১৯৮	৩৯৩
২০১০-১১	৩৫৭	২০৮	৫৬৫
২০১১-১২	৩১৮	২৪২	৫৬০
২০১২-১৩	৪১৯	২৫১	৬৭০
২০১৩-১৪	৪৯৯	২৫৬	৭৫৫
২০১৪-১৫	৪৭৬	২৫৯	৭৩৫
২০১৫-১৬	৫১০	২৬৯	৭৭৯
২০১৬-১৭	৫৪৫	২৯৫	৮৪০
২০১৭-১৮	৮৪৯	৩০১	১১৫০
২০১৮-১৯	৯৮৯	৩২০	১৩০৯

সূত্র: বাজেটের বিভিন্ন বছরের সংক্ষিপ্তসার

কিন্তু, বরাদ্দকৃত এই অর্থ শুধুমাত্র পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এই অঞ্চলে বসবাসকারী সেটেলার বাঙালি ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উন্নয়ন খাতেও খরচ হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির ২০ বছর অতিবাহিত হয়ে গেলেও এ চুক্তি পূর্ণ বাস্তবায়নে সরকারের বার বার অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত বরাদ্দ জাতীয় বাজেটে রাখা হয় না। জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য 'টাস্কফোর্স' গঠিত হয়েছে, কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ও পুনর্বাসন বাবদ জাতীয় বাজেটে আর্থিক বরাদ্দ নেই। পার্বত্য চুক্তির ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হলেও এটি শক্তিশালীকরণে পর্যাপ্ত বরাদ্দ জাতীয় বাজেটে রাখা হয় না। তদুপরি, গতবছর লংগদুতে ২৫০টি বাড়িঘর পুড়ে নিঃস্ব অসহায় পাহাড়িদের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিতে সরকারি বরাদ্দ পাওয়া যায় না।

সমতলের আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ

সমতলের ২০ লক্ষাধিক আদিবাসীদের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দের কোন নির্দিষ্ট খাত/বিভাগ নেই। তাদের জন্য বরাদ্দ বলতে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে বাস্তবায়নাধীন Development Assistance for Special Area (except CHT) বা "বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)"[৫] শীর্ষক কর্মসূচিকে বুঝে থাকি। ২০০৯-১০ হতে ২০১৭-১৮ বিগত ৯টি অর্থ বছরে মোট ১৫৬.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন। বিগত ৯ বছরের সমতলের আদিবাসীদের জন্যে অর্থাৎ ৬১টি জেলার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ মোটেই সঙ্গত নয়। সরকারি পরিসংখ্যানের মতে, হিসাব কষলে বিগত ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১ জন সমতলের আদিবাসীর জন্য গড়ে বাজেট হয় ৮০ থেকে ১০০ টাকা। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে তা দাঁড়ায় ১৫০ টাকায়। হিসেব কষলে, জাতীয় বাজেটে গড়ে প্রতি জনের জন্য বরাদ্দ যেখানে প্রায় ২৫,৬৯১ টাকা সেখানে পিছিয়ে পড়া বঞ্চিত একজন সমতলের আদিবাসী প্রেষণামূলক বার্ষিক বরাদ্দ ১৫০ টাকা। একদিকে যেমন অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ আদিবাসী জনসংখ্যা অনুযায়ী খুবই কম আবার অন্যদিকে এ বরাদ্দকৃত অর্থ বণ্টন প্রক্রিয়ার মধ্যেও রয়েছে নানা জটিলতা। বাজেট বাস্তবায়নে আদিবাসী প্রতিনিধিদের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। আবার, প্রতি বছর সবগুলো উপজেলার আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে

[৫] http://www.pmo.gov.bd/site/page/0c0d429d-1c42-4a82-905b-aaccf429d192/বিশেষ-এলাকার-জন্য-উন্নয়ন-সহায়তা-(পার্বত্য-চট্টগ্রাম-ব্যতীত)

একসাথে নির্দিষ্ট পরিমাণ এ বরাদ্দ প্রদান করা হয় না। ফলে, প্রকৃত আদিবাসী উপকারভোগী জনগণ এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্তিকরণ

দুঃখের বিষয় হলেও সত্যি, বিশেষ এলাকার জন্য উন্নয়ন সহায়তা (পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত)-এ থোক বরাদ্দ ছাড়া আদিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে নির্দিষ্ট করে কোন কার্যক্রম বা বরাদ্দ এখানে চোখে পড়ে না। গত বছর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ৫৪,২৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। যেখানে আদিবাসীদের জন্য একটি থোক বরাদ্দ রয়েছে মাত্র ৩০ কোটি টাকার, যা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মোট বরাদ্দের মাত্র ০.০৫%। যার ফলে আদিবাসী পিছিয়ে পড়া মানুষ বাজেটের খাতভুক্ত বরাদ্দে বরাবরই অবহেলিত থেকে যাচ্ছে। সমতলের আদিবাসীদের জন্য বিগত ৩ অর্থ বছরে ১৬০টি উপজেলায় ৪০০টি আয়বর্ধনমূলক প্রকল্পে ৯.৮০ কোটি টাকা খরচ হয়। সমতলের সহজ সরল আদিবাসীরা আমলাতন্ত্রের জটিলতার মধ্যে কতটুকু এই উপকার ভোগ করতে পেরেছে, তা সত্যিই ভাবার বিষয়। তাছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্যান্য কর্মসূচি যেমন: ভিজিএফ, ভিজিডি, এফএফই, কাবিখা, কাবিটা ইত্যাদিতেও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি খুবই কম।

মন্ত্রণালয়ভিত্তিক আদিবাসী বাজেট চাই

পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ে (যেখানে আদিবাসীদের জন্য একটি অংশ বরাদ্দ থাকে) ১,১৫০ কোটি টাকা আর সমতলের জন্য মাত্র ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ আদিবাসীদের জন্য যথেষ্ট নয়। আবার সমতলের আদিবাসীদের জন্য বড় সমস্যা হলো তাদের উন্নয়নে বরাদ্দ বাস্তবায়নে সরাসরি কোন মন্ত্রণালয় বা খাত নেই। প্রধানমন্ত্রীর অধীনে একটি থোক বরাদ্দ রয়েছে যা বর্তমানে মাত্র ৩০ কোটি টাকা। হিসেব কষলে সমতলের একজন আদিবাসীর ভাগে পড়ে মাত্র ১৫০ টাকা। দীর্ঘ সময় থেকে বঞ্চিত হয়ে আসা সমতলের আদিবাসী কিংবা গোবিন্দগঞ্জের বাগদা ফার্ম থেকে উচ্ছেদকৃত হাজারো সাঁওতাল পরিবার যারা খোলা আকাশের নিচে বসবাস করছে তাদের কাছে এ অর্থ উপহাস ছাড়া কিছুই নয়। এটা দিয়ে সমতলের ২০ লক্ষাধিক মানুষের জীবনমান উন্নয়ন কোনভাবেই সম্ভব নয়। তার চেয়েও দুঃখজনক ব্যাপার হলো, এই অর্থ বাস্তবায়নে সমতলের আদিবাসীদের কোন অংশগ্রহণ বা ক্ষমতা নেই।

সমতলের আদিবাসীদের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ ২০০৯-১০ হতে ২০১৭-১৮ (অংকসমূহ কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট বাজেট
২০০৯-১০	৮
২০১০-১১	১৪
২০১১-১২	১৫
২০১২-১৩	১৭
২০১৩-১৪	১৬
২০১৪-১৫	১৬
২০১৫-১৬	২০
২০১৬-১৭	২০
২০১৭-১৮	৩০
২০১৮-১৯	৪০

সূত্র: গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচির এডিপি বরাদ্দের সংক্ষিপ্তসার

আদিবাসীদের অধিকার বাস্তবায়নে জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের প্রস্তাব

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনে উন্নয়নের বিকাশ ঘটাতে হলে প্রয়োজন জাতীয় বাজেটে আদিবাসীদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি ও বরাদ্দের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে আদিবাসীদের সম্পৃক্তকরণ। তখন খুব সহজে তারা দেশের মূল স্রোতের জনগণের সহিত সামনে অগ্রসর হবার সুযোগ পাবে এবং ক্রমান্বয়ে অনগ্রসরতা কাটিয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য এই সময়ে আমাদের প্রস্তাব–

১. আদিবাসী জনগণের উন্নয়নের জন্য খাতভিত্তিক ও মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে; সকল মন্ত্রণালয়ের/বিভাগের বাজেটে আদিবাসীদের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ রাখা এবং বরাদ্দের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে আদিবাসীদের সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এ বিষয়ে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে;

২. জাতীয় বাজেট বক্তৃতায় আদিবাসী বিষয়ে স্পষ্ট বিবরণী থাকতে হবে। আদিবাসী জনগণের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ এবং সংখ্যারভিত্তিতে আদিবাসীদের বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে; বাজেট বরাদ্দ সাধারণত হয় মন্ত্রণালয়ভিত্তিক। সংখ্যাগরিষ্ঠ আদিবাসীর বাস সমতলে। সমতলের আদিবাসীদের বিষয়টি দেখার জন্য এখনও কোনো মন্ত্রণালয় বা বিভাগ নেই। তাই, সমতলের আদিবাসীদের জন্য একটি পৃথক

মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে; এজন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখতে হবে;

৩. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ১৯৯৭ এর পূর্ণ বাস্তবায়নে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি-বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১-এর যথাযথ বাস্তবায়ন ও ভূমি কমিশনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বরাদ্দ রাখতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদসমূহের বাজেট বৃদ্ধি করতে হবে। পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদের সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা শক্তিশালীকরণে পর্যাপ্ত বাজেট রাখতে হবে; জুম্ম শরণার্থী ও আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য 'টাস্কফোর্স' ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ রাখতে হবে;

৪. আদিবাসী বা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক একাডেমিগুলোতে আদিবাসী সংস্কৃতি উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু নাচ-গান নয়, এ একাডেমিগুলোতে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও গবেষণার জন্য বিশেষ বরাদ্দ রাখতে হবে;

৫. সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও সামাজিক ক্ষমতায়নের বাজেট খাতে আদিবাসীদের উন্নয়নে নির্দিষ্ট প্রকল্প/কার্যক্রম হাতে নিতে হবে এবং নিরাপত্তা বেষ্টনীর অন্যান্য কার্যক্রমেও তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে নির্দেশনা থাকতে হবে;

৬. উচ্চ শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষায় বৃত্তিসহ আদিবাসী নারী ও তরুণদের আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য বাজেট বরাদ্দ থাকতে হবে।

৭. আদিবাসীদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখতে হবে।

৮. আদিবাসীদের পৃথক পৃথক জাতিস্বত্তা এবং পরিচয়ের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান এবং আদিবাসী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদসমূহে স্বাক্ষর নিশ্চিত করা; যথাযথ গবেষণার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তির বিষয়গুলো চিহ্নিত করে বিদ্যমান আইন ও নীতিসমূহকে আদিবাসীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হবে;

৯. সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আদিবাসীদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক করার লক্ষ্যে সেবাপ্রদানকারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চর্চা পরিবর্তনের জন্য সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা; সমতলের আদিবাসীদের ভূমি সমস্যা সমাধানে পৃথক ভূমি কমিশন গঠন এবং তাদের জমির মালিকানা সমস্যার কার্যকর নিষ্পত্তি করতে হবে;

১০. আদিবাসীদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও মর্যাদার উন্নয়নে তাদের মতামতের ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করতে জনঅংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি কাঠামো তৈরি ও সেগুলোর চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

সংবিধানের ২৩ (ক) ধারায় দেশের জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।' অর্থাৎ বাংলাদেশের সংবিধানের যে অঙ্গীকার- ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থান নির্বিশেষে সব মানুষ সমান- তার মূল সুরকে ধারণ করে যদি উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হয় তাহলে প্রয়োজন এক নবতর উন্নয়ন দৃষ্টিভঙ্গি। আর তার সূচনা হতে পারে দলিত ও আদিবাসীদের মতো সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর নাগরিকদের জন্য বিশেষ উন্নয়ন ও নীতি পরিকাঠামো তৈরির উদ্যোগ নেওয়ার মধ্য দিয়ে।

অংশগ্রহণমূলক প্রতিবন্ধী-বান্ধব বাজেট চাই

বাংলাদেশের উন্নয়ন ও প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী

উন্নয়নের মূলধারায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হলে অ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তুলনায় বাড়তি বা সহায়ক ব্যয় বিবেচনায় আনা জরুরি। নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন এটাকেই 'Conversion handicap' নামে অভিহিত করেছেন।[১] প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের বাইরে রাখলে বাংলাদেশ প্রতি বছর হারায় জিডিপির শতকরা ১.৭ ভাগ[২]। আমাদের জাতীয় বাজেটে শিক্ষা ব্যতিরেকে অন্যান্য ক্ষেত্র যেমন কর্মসংস্থান, বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য সরাসরি কোন উল্লেখ নাই। সর্বোপরি, বাজেটের আকার ও ক্ষেত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বাড়ানো হলেও এখনও পর্যন্ত বরাদ্দের অর্থ গতানুগতিক কিছু ভাতা ও সুবিধার মধ্যে সীমিত রয়েছে। বাজেট বরাদ্দে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়ে কোনো কর্মসূচি নাই।

বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী মানুষের সংখ্যা কতো?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বিষয়ক পরিসংখ্যান

- আদশুমারী ২০১১ঃ ১.৪১%
- খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১০ঃ ৯.০৭%
- খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ঃ ৬.৯৪%
- প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ (২৪ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত)ঃ ১৬,৫০,১৯৯ জন

সরকারের একেক প্রতিবেদন একেক রকম তথ্য হাজির করছে। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাজেট বারদ্দের ক্ষেত্রে তথ্যের এই 'গড়মিল' মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি করেছে। এর সুরাহা হওয়া দরকার। পরিসংখ্যান বিভাগের উদ্যোগে একটি মাত্র জরিপ বা শুমারির মাধ্যমে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা নিরূপিত হওয়া উচিত।

এক নজরে প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রধান আইনগত সুযোগ-সুবিধা

- বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিক এ দঃস্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কম খরচে চিকিৎসা সেবা প্রদান
- সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চিকিৎসা উপকরণের ব্যবস্থা করাসহ চিকিৎসক, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য ন্যায্য বন্দোবস্তের (reasonable accommodation) ব্যবস্থা

বর্তমানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি খাতে বরাদ্দ

- ১০ লক্ষ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য জনপ্রতি ভাতা ৭০০ টাকা
- ৯০ হাজার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর জন্য উপবৃত্তি ৮০.৩৭ কোটি টাকা
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিদ্যালয়ের জন্য মঞ্জুরি ২৩ কোটি টাকা
- দুস্থ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য পুনর্বাসন তহবিল ১.৫০ কোট টাকা
- নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের জন্য বরাদ্দ ২৭.৫০ কোটি টাকা
- শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্ট এর জন্য বরাদ্দ ১০ কোটি টাকা

১ Sabri, AA (2017) Financing Inclusion? Pronounced Commitment, Un-dialoged Space …., a paper presented at the international conference on Inclusive Education held in Dhaka during January 13-15, 2017

২ World Disability Report 2011

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি করা এবং এই ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণকে কর রেয়াতের সুবিধা প্রদান
- সরকারি-বেসরকারি, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য নির্ধারিত বয়সসীমা শিথিলকরণ এবং কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা
- বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী ও দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিতে, পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশু, প্রতিবন্ধী নারী এবং বয়স্ক প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা
- সকল দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য ৫% কোটার ব্যবস্থা করা।
- ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ ৬৫ কোটি টাকা
- সরকারি শিশু পরিবার ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ বাবদ বরাদ্দ ২৮.৬৬ কোটি টাকা
- বাংলাদেশ অটিস্টিক একাডেমি স্থাপন বাবদ বরাদ্দ ৩০ কোটি টাকা
- মানিকগঞ্জে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ বাবদ বরাদ্দ ৩.০৬ কোটি টাকা
- শতভাগ পেনশন সমর্পনকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মৃত্যুও পর তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানকে আজীবন মাসিক চিকিৎসা ও উৎসব ভাতা প্রদান
- কোন করদাতার প্রতিবন্ধী সন্তান বা পোষ্য থাকলে করদাতার জন্য করমুক্ত আয়সীমা ৩ লক্ষ টাকা

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দের ধারা

নীচের লেখচিত্র- ১ অনুযায়ী, ২০১৪-১৫ থেকে ২০১৮-১৯ পর্যন্ত ৫ বছরের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেও জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য গৃহিত কার্যক্রমের বরাদ্দও এই খাতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বরাদ্দ সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন খাতের বরাদ্দের মাত্র ১.৭৩% (সরকারি শিশু পরিবার এর জন্য হোস্টেল নির্মাণসহ), যা বিগত ২০১৭-১৮ সালে ছিল ১.৭৬%, ২০১৬-১৭সালে ছিল ১.৬৭%, ২০১৫-১৬ সালে ছিল ১.৪% এবং ২০১৪-১৫ সালে ১.০২% যদিও সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন সম্পর্কিত বাজেট লাইনে এ সংক্রান্ত বরাদ্দ আনুপাতিক ভাবে বছরওয়ারি বেড়েছে, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদার তুলনায় তা খুবই অপ্রতুল।

লেখচিত্র ১: সামাজিক নিরাপত্তা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বাজেট (কোটি টাকায়)

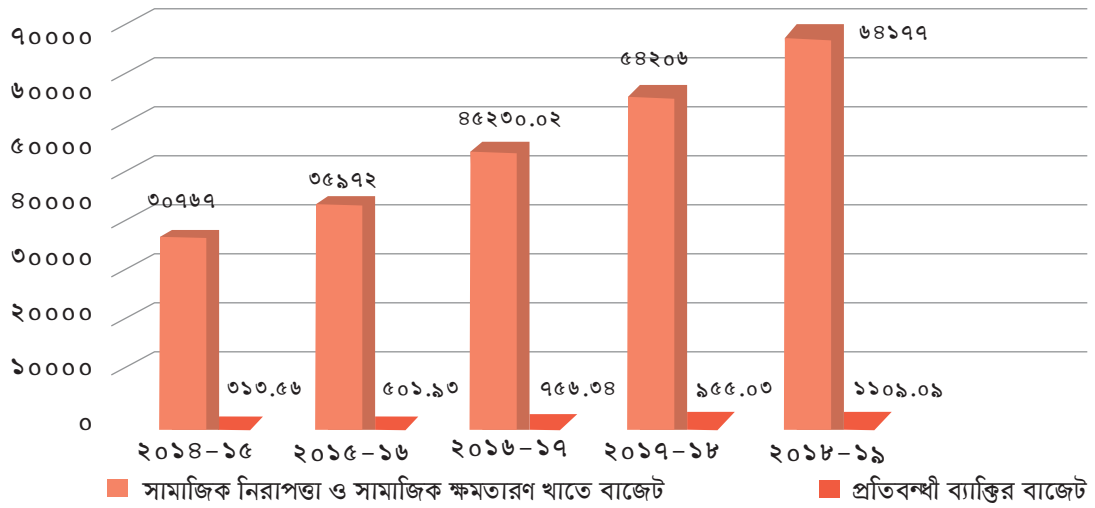

পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ নেই

জাতীয় পরিকল্পনা ও বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মতামতের প্রতিফলন ও কার্যকর অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়না। ফলে প্রতিবছর যে বাজেট বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে তা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল। উপজেলা- জেলা পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষায়িত সেবা নিশ্চিত হচ্ছে না।

প্রস্তাবনা

বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদার প্রতিফলন ঘটাতে হলে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনা দরকার। অন্য কথায়, গতানুগতিক ধারায় কল্যাণমূলক বা সেবামূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তে 'সামাজিক মডেল' বিবেচনায় আনতে হবে। এছাড়া বরাদ্দের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদা অ-প্রতিবন্ধী ব্যক্তির চাহিদা থেকে যে আলাদা তা বিবেচনায় নিতে হবে। এইসব বিবেচনায় প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী-বান্ধব বাজেট প্রণয়ন তিনটি পূর্বশর্তের ওপর ভিত্তিশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়:

১. প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার বিষয়ে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক সনদ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, দেশীয় আইন ও নীতিমালা অনুসরণ

২. সামাজিক মডেল অনুসরণ

৩. বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে দ্বি-স্তরভিত্তিক অর্থায়ন (Twin Track Financing)।

এই তিনটি পূর্বশর্তের আলোকে আসন্ন বাজেটে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করা হচ্ছে:

১. বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক কোন পরিসংখ্যান নেই। আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অনেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এখনো জরিপের বাইরে রয়েছে। অথচ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যার ওপর নির্ভর করে যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাজেট বরাদ্দ। তাই বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা অত্যন্ত জরুরি

২. দেশে ৯০% প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত[৩]। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষার আওতায় আনতে ও ঝরেপড়া রোধ করতে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে উপবৃত্তির সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। উপবৃত্তি উপকারভোগীর সংখ্যা ৯০ হাজার থেকে ৩ লক্ষ করার সুপারিশ করছি।

৩. শিক্ষায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে শিক্ষা ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো প্রবেশগম্য করা (র‍্যাম্প, লিফ্ট, প্রশস্ত দরজা ইত্যাদি), তথ্যগত প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা (শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী করা যেমন- ব্রেইল বই, ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া টকিং বই, এক্সেসিবল ই-বুক ইত্যাদি), একীভূত শিক্ষাকার্যক্রম বাস্তবায়নে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, কারিকুলামে ইশারা ভাষা ও ব্রেইল পদ্ধতি অন্তর্ভুক্ত করা এবং পাঠদান ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপযোগী করতে বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

৪. বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি চাকুরিতে কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছেনা। যা বাস্তবায়নে কার্যকর উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ তে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বেসরকারিভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কর রেয়াতের সুবিধার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং তা বাস্তবায়নে বাজেটে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকা প্রয়োজন। কর্মসংস্থানে বাধা দুর করতে কর্মক্ষেত্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগিকরণ অত্যাবশ্যক। আগামী বাজেটে এ বিষয়ে যথাযথ বরাদ্দের দাবি জানাচ্ছি। বেকার সমস্যা হ্রাস করতে প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে "আত্মকর্মসংস্থান অর্থায়ন তহবিল" গঠন করে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

৫. প্রতিবন্ধী নারীদের কর্মসংস্থানে সম্পৃক্ততা বাড়াতে কর্মজীবি মহিলা হোস্টেলগুলো প্রবেশগম্য করে অন্তত ১০% আসন প্রতিবন্ধী নারীদের জন্য সংরক্ষণ করতে বাজেট বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

৬. ডিজিটাল বাংলাদেশের সেবায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করতে সকল ওয়েবসাইট, সরকারিই-সার্ভিস, ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্র ইত্যাদি তাদের ব্যাবহার উপযোগী হওয়া উচিত। সুতরাং অবকাঠামোগত ও তথ্যগত প্রবেশগম্যতার জন্য ৫০০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

[৩] ইউনিসেফএর দক্ষিণএশিয়াআঞ্চলিকগবেষণা, ২০১৪

৭. বাংলাদেশে এ পর্যন্ত একটি বাসও নেই যেখানে হুইল চেয়ার ব্যবহারকারীরা ব্যবহার করতে পারে। তাই প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে পরিবহন সুবিধা পেতে পারে, এজন্য সকল বাস স্ট্যান্ড, নৌটার্মিনাল, ট্রেনের প্ল্যাটফর্ম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্য করতেবাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। একইসাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের চলাচলের জন্য ঢাকা শহরে ১৫ টি ও বিভাগীয় পর্যায়ে আরো ৭ টি প্রবেশগম্য বাস আমদানির জন্য বাজেটে যথাযথ বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

৮. সরকারের আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য স্থানচ্যুত, গৃহহীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসন এর ব্যবস্থা করে দুর্যোগ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনের জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা এবং কর্মজীবী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসনের জন্য সরকারী ঋণ প্রদান প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা রাখার নির্দেশনা প্রদানের সুপারিশ করছি।

৯. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ ছাড়া কোন বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, যুব ও ক্রীড়া, শ্রম ও কর্মসংস্থান, মহিলা ও শিশু, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, গৃহায়ন ও গণপূর্ত, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাজেটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে বাজেট বরাদ্দ জরুরি।

১০. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ও ক্রীড়া উন্নয়ন প্রসারের লক্ষ্যে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ধরণ ও চাহিদা মোতাবেক মানসম্পন্ন সহায়ক উপকরণ দরিদ্র প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিনামূল্যে সরবরাহ করার জন্য বাজেটে পর্যাপ্ত বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১১. সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর উপখাতে বিভিন্ন তহবিল গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন ২০১৩ -তে উল্লিখিত ১১ প্রকারের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যাতে উপকৃত হতে পারে সেজন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন তহবিল গঠন করে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

১২. অতি গুরুতর প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনযাত্রার ব্যয় তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। তাদের জন্য কেয়ারগিভারের প্রয়োজন হয়। এ বিষয় বিবেচনায় এনে অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা জনপ্রতি মাসিক ন্যূনতম ১৬০০ টাকায় উন্নীত করার জন্য সুপারিশ করছি।

১৩. প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, সহিংসতা ও নির্যাতন হ্রাসকল্পে তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপক সচেতনতা কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। এসকল কার্যক্রম প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সংগঠন (ডিপিও) যেহেতু তৃণমূল পর্যায়ে সফলভাবে পরিচালনা করছে, সুতরাং এসকল কার্যক্রম আরো জোরালোভাবে পরিচালনার জন্য ডিপিও'দের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের সুপারিশ করছি।

মেগা প্রকল্পে বিনিয়োগ ও উন্নয়ন বাজেটে ন্যায্যতার প্রশ্ন

ভূমিকা

অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সামাজিক অবকাঠামো খাতের পাশাপাশি সরকার ভৌত অবকাঠামো খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে, সরকারি বিনিয়োগে কাংখিত গতিশীলতা আনয়ন ও বেসরকারি খাতের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো দ্রুততম সময়ে বিনির্মাণে সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিতে মেগা ভৌত অবকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদে বিদ্যুৎ জ্বালানী, সড়ক, সেতু রেলপথ, নৌ পরিবহন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়/বিভাগের অনুকুলে মোট ২৯৫৪ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দের প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যা গড়ে এডিপির ৪০.৮৩ শতাংশ। এ সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অধীনে সড়ক, সেতু, রেলপথ, মেট্রোরেল, বিদ্যুৎ, জ্বালানী, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং গভীর সমুদ্র বন্দরের মত গুরুত্বপূর্ণ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে।

মেগা প্রকল্প হল বৃহৎ বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতি, জটিলতর সাংগঠনিক বিন্যাস এবং অর্থনীতি, পরিবেশ, রাষ্ট্র ও সমাজের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তারকারী প্রকল্প। বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ ও ভূমি দারিদ্রের দেশে মেগা প্রকল্পগুলোর জন্য ভূমি সংস্থান করাও বিশেষ উদ্বেগের কারণ। বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে এ ধরণের অনেকগুলো মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া চলমান আছে। বলা হচ্ছে, এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অনেক বেড়ে যাবে। বাস্তবতা হলো, এসব প্রকল্প বাৎসরিক উন্নয়ন বাজেটের সুষম বন্টনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে, ভূমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষ ও পরিবেশের ওপর নানারূপ জটিলতা ও প্রভাব রাখছে। এসব প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে, বৃহৎ সেতু, মহাসড়ক, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, সমুদ্র বন্দর, অর্থনৈতিক অঞ্চল ইত্যাদি। পরিবেশবিদ ও নাগরিক সমাজ ইতোমধ্যেই এসব প্রকল্পের সামাজিক ও পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাব নিয়ে উচ্চকিত হয়েছেন।

বাংলাদেশের ২০১৮-১৯ বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটে মোট বরাদ্দপ্রাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে ১ হাজার ৪৫১টি। এর মধ্যে 'ফাস্ট ট্র্যাক' প্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত ১০টি বিশেষ ভৌত অবকাঠামোগত মেগা প্রকল্প। "দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে প্রবৃদ্ধি সঞ্চালক ১০টি বৃহৎ প্রকল্পকে মেগাপ্রকল্প হিসাবে চিহ্নিত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নজরদারিতে আনা হয়েছে। এসব প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পরীবিক্ষণের জন্য ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে 'ফাস্ট ট্র্যাক প্রজেক্ট মনিটরিং কমিটি' নামে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিবকে সভাপতি করে গঠন করা হয়েছে 'ফাস্ট ট্র্যাক টাস্কফোর্স'।

ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের মন্ত্রনালয় ও খাতসমূহ

১০টি ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের মধ্যে ৬টি প্রকল্পই সড়ক ও পরিবহন সেক্টরে, ২টি প্রকল্প রয়েছে বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সেক্টরে এবং ১টি করে প্রকল্প রয়েছে যথাক্রমে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগে। উল্লেখ্য যে, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পটি কেন বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগে তা নিয়ে অনেকের মনে প্রশ্ন আছে।

সেক্টরভিত্তিক শতকরা হার

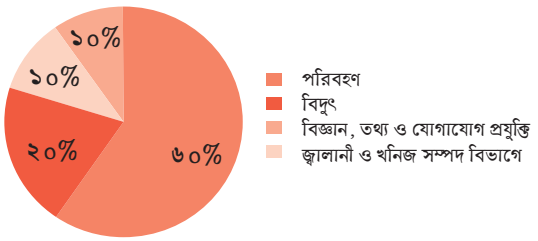

বার্ষিক উন্নয়ন বাজেটের ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১৪৫১ টি প্রকল্পের জন্য মোট বরাদ্দ আছে ১৮০৮৬৯.১৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে

১০টি ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের মধ্যে ৭টি প্রকল্পের অনুকুলে বরাদ্দ আছে মোট ২৯৫৮৩.২৫ কোটি টাকা। যা মোট উন্নয়ন বাজেটের প্রায় ১৬ শতাংশ। উল্লেখ্য যে, ১০টি ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের মধ্যে ৮টির অনুকুলে মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ২৭৭৮৮৮.৬২ কোটি টাকা। গড়ে প্রতিটির প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ৩৪৭৩৬ কোটি টাকা।

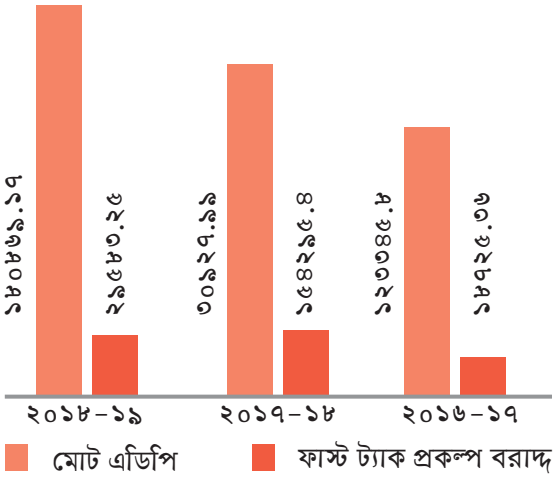

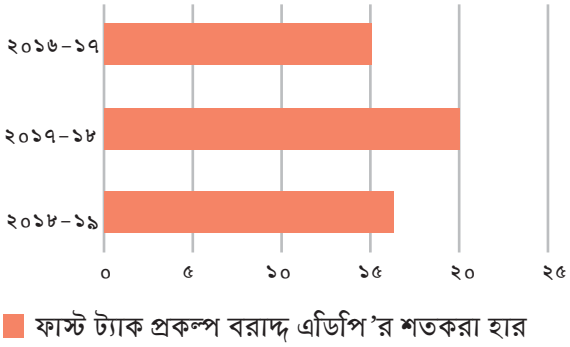

টেবিল ১: ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের ব্যয়, অর্থায়ন ও বছরভিত্তিক এডিবি চিত্র

ক্রম নং	ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয়	অর্থায়ন বা সম্পদের উৎস			অর্থ বছরভিত্তিক এডিবি বরাদ্দ		
			জিওবি বা নিজস্ব	প্রকল্প সাহায্য বা বৈদেশিক ঋণ	নিজস্ব বা বাস্তবায়নকারী সংস্থা	২০১৮-১৯	২০১৭-১৮	২০১৬-১৭
১	পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প	৩০১৯৪.৪	৩০১৯৩.৪	০		৪৩৯৫.৬৬	৫৫২৪.৩৬	৬০২৪.৪৮
২	পদ্মা রেলসেতু সংযোগ প্রকল্প	৩৯২৪৬.৮	১৮২১০.১১	২১০৩৬.৬৯		৫৩৩০.৩৭	৭৬০৯.৮১	৪১০২.১৩
৩	চট্টগ্রাম-দোহাজারী থেকে রামু-কক্সবাজার এবং রামু-গুনদুম রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প	১৮০৩৪.৪৮	৪৯১৯.০৭	১৩১১৫.৪১		১৪৫০	১৫৬১.২৪	৬১৩.৭৫
৪	ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প	২১৯৮৫.০৭	৫৩৯০.৪৮	১৬৫৯৪.৫৯		৩৯০২.৫	৩৪২৫.৮৩	২২২৭
৫	পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো/সুবিধাদির উন্নয়ন (প্রথম সংশোধিত)	৩৩৫০.৫১	৩৩৫০.৫১	০		৫৭৮.৪৬	৪০০	২০০
৬	মাতারবাড়ি ২*৬০০ মেঃ ওঃ আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প	৩৫৯৮৪.৪৫	৪৯২৬.৬৫	২৮৯৩৯	২১১৮.৭৬	২৮২৭	২২২০	২৪০০
৭	মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ প্রকল্প (২×৬৬০ মেগাওয়াট), রামপাল	১৬০০০	১৬০০	১৪৪০০				২৫৪০
৮	রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	১১৩০৯২.৯১	২২০৫২.৯১	৯১০৪০		১১০৯৯.২৬	১০১৮৬.৭৫	৬১৮
মোট	৮টি প্রকল্প*	২৭৭৮৮৮.৬২	৯০৬৪৩.১৩	১৮৫১২৫.৬৯	২১১৮.৭৬	২৯৫৮৩.২৫	৩০৯২৭.৯৯	১৮৭২৫.৩৬

* মহেশখালী এলএনজি টার্মিনাল ও সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর প্রকল্প ২টি এখনও এডিপিভুক্ত হয়নি। তবে সম্ভাব্য প্রাক্কলন ব্যয় ধরা হয়েছে যথাক্রমে ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ও ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বিভিন্ন অর্থবছরে এডিপি ও ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্প বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র-

উল্লেখ্য যে, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অবকাঠামো খাতের মন্ত্রনালয়/বিভাগ (বিদ্যুৎ জ্বালানী, সড়ক, সেতু রেলপথ, নৌ পরিবহন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি) এর অনুকুলে মোট ৪৪৬.৩ বিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যা মোট এডিপির ৪০.৩২ শতাংশ।

মেগা প্রকল্পের অগ্রগতি ও অন্যান্য তথ্য

পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্প

মেয়াদ: ০১/০১/২০০৯ - ৩১/১২/২০১৮। বিনিয়োগকারীঃ নিজস্ব বিনিয়োগ। অগ্রগতিঃ ৬১.২% মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত (১৮৪৮০.৪৮ কোটি টাকা)। প্রাক্কলন সংশোধনঃ প্রথম প্রাক্কলন ২০০৭- ১০১৬১.৭৫ কোটি টাকা। পরবর্তীতে ৩ দফা সংশোধনীর মাধ্যমে ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণঃ ৫৮৪৪.২৪ একর। পূণর্বাসনঃ ৪টি পূণর্বাসন কলোনীতে ২১২৩ টি আবাসিক প্লট (২.৫, ৫.০০ ও ৭.৫ শতাংশ জমিখন্ড) ও ৮০ টি বাণিজ্যিক প্লট প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বন্টন প্রক্রিয়া চলমান আছে। সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকিঃ পদ্মা বাংলাদেশের প্রধান নদী। এই নদীর ওপর সেতু নির্মাণ করার জন্য যতটা গভীর ও বিস্তৃত গবেষণার প্রয়োজন ছিল তা করা হয়নি। ১৪ কি: মি: নদী শাসন করা হবে। সমাজ ও পরিবেশের ওপর পদ্মা সেতুর জন্য নদী শাসনের ফলে কত ধরণের সুদুর প্রসারী প্রভাব পড়বে তা এখনি বলা কঠিন। তবে এটুকু বলা যায়, সেতু এবং নদী শাসনের কারণে পদ্মা মরে গেলে এই মহাযজ্ঞ বিফলে যাবে। অর্থনৈতিক সম্ভাবনাঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১৯টি জেলা ঢাকা ও পূর্বাঞ্চলের সাথে যুক্ত হবে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ১.২% বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে ও প্রতিবছর ০.৮৪ শতাংশ হারে দারিদ্র নিরসিত হবে।

পদ্মা রেলসেতু সংযোগ প্রকল্প

মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২২। বিনিয়োগকারীঃ চীন ও নিজস্ব। অগ্রগতিঃ ভৌত ১৬.৯১, আর্থিক ২৩.৫৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত। প্রাক্কলন সংশোধনঃ ১ বার সংশোধণীর মাধ্যমে ব্যয় বৃদ্ধি।

ভূমি অধিগ্রহণঃ ১৭০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হবে। এছাড়া সড়ক জনপথ অধিদপ্তরের ২০০ একর ও সেতু কর্তৃপক্ষের ৬৮ একর ভূমি স্থানান্তর করা হবে। অর্থনৈতিক সম্ভাবনাঃ জিডিপি'র হার ১% বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

চট্টগ্রাম-দোহাজারী থেকে রামু-কক্সবাজার এবং রামু-গুনদুম রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প

মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০২২। বিনিয়োগকারীঃ এডিবি ও চীন। অগ্রগতিঃ ভৌত ২৩%, আর্থিক ১৯.১৪% মে ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত। প্রাক্কলন সংশোধনঃ ২০১৬ সালে একবার সংশোধনীর মাধ্যমে ১৮৫২ কোটি (২০১০) থেকে ১৮০৩৪ কোটি টাকা করা হয়। ভূমি অধিগ্রহণঃ ১৭৪১ একর ভূমি অধিগ্রহণ। অর্থনৈতিক সম্ভাবনাঃ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশে বিনিয়োগ গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে ও রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প

মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১২ - ৩০/০৬/২০২৪। বিনিয়োগকারীঃ জাইকা। অগ্রগতিঃ ২৩.৪৭% ও ৯২১০ কোটি টাকা। অর্থনৈতিক সম্ভাবনাঃ নগর উন্নয়ন সমৃদ্ধ হবে। ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী গণযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।

পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন

মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১২ - ৩০/০৬/২০২৪। বিনিয়োগকারীঃ জাইকা। অগ্রগতিঃ ২৩.৪৭% ও ৯২১০ কোটি টাকা। অর্থনৈতিক সম্ভাবনাঃ নগর উন্নয়ন সমৃদ্ধ হবে। ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী গণযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।

মাতারবাড়ি ২*৬০০ মেঃ ওঃ আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প

মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২৩। বিনিয়োগকারীঃ জাইকা। অগ্রগতিঃ ২১.১৫% ও ৭৫২৮ কোটি টাকা জানুয়ারী-২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত। ভূমি অধিগ্রহণঃ১৪১৪ একর লবন ও চিংড়ী জমি। পূণর্বাসনঃ ৪৫ টি উচ্ছেদকৃত পরিবারের পূণর্বাসন প্রকল্প কার্যক্রম চলমান আছে। বিকল্প কর্মসংস্থনের ব্যবস্থা করা হয়নি। এছাড়া ক্ষতিপূরণ ও পূণর্বাসনের দাবীতে স্থানীয় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ ক্ষুব্ধ। সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকিঃ লবণ ও চিংড়ি চাষীরা পেশা হারিয়েছেন। প্রকল্পের নির্মাণ কাজের কারণে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হচ্ছে। অর্থনৈতিক সম্ভাবনাঃ আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে।

সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প

মেয়াদঃ ৫ বছর (প্রথম পর্যায়)। সেক্টরঃ পরিবহন। সাবসেক্টরঃ নৌ- পরিবহন। বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ জি টু জি। বরাদ্দ ও অর্থায়নঃ ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

(প্রথম পর্যায়)। ৭৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পিপিপি'র আওতায়, অবশিষ্ট অর্থ নন পিপিপি থেকে সংস্থান করতে হবে। বিনিয়োগকারীঃ চীন, ভারত, নেদারল্যান্ড, দুবাই (সম্ভাব্য)। অগ্রগতিঃ কারিগরি ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ হয়েছে। সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকিঃ সোনাদিয়া দ্বীপটি একটি ইকোলজিক্যাল ক্রিটিক্যাল এরিয়া। ফলে এখানে সমূহ পরিবেশগত ঝুঁকি রয়েছে। অর্থনৈতিক সম্ভাবনাঃ প্রতিবেশী ল্যান্ডলক দেশ যেমন- নেপাল, ভুটান ও ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সেভেন সিস্টার্স প্রদেশগুলোর এই বন্দর ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

মহেশখালী ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প

মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৮। অগ্রগতিঃ ১৩০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

মৈত্রী সুপার থার্মাল বিদ্যুৎ প্রকল্প (২৬৬০ মেগাওয়াট), রামপাল

মেয়াদঃ ০১/০৭/২০১৪-৩০/০৬/২০২৩।
বিনিয়োগকারীঃ এনটিপিসি ও এক্সিম ব্যাংক ইন্ডিয়া। অগ্রগতিঃ ২২.৮০% ও ৩৬৪৭ কোটি টাকা। জানুয়ারি-২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত। ভূমি অধিগ্রহণঃ ১৮৩৬ একর, চিংড়ী জমি। সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকিঃ পরিবেশবিদরা মনে করেন, এই প্রকল্পের কারণে পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

মেয়াদঃ ০১/০৪/২০১৬ - ৩১/১২/২০২৫।
বিনিয়োগকারীঃ রাশিয়া। অগ্রগতিঃ ১৩.৯৫% ও ১৫৭৫১ কোটি টাকা, জানুয়ারী-২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত। ভূমি অধিগ্রহণঃ ২৬০ একর পাকিস্তান আমলে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে প্রকল্পের প্রয়োজনে পদ্মা নদীতে জেগে উঠা চরের আরও ৮০০ একর জমি প্রকল্পের অনুকূলে হস্তান্তর হবে। সামাজিক ও পরিবেশগত ঝুঁকিঃ বাংলাদেশের মত ঘনবসতিপূর্ণ দেশে এ ধরণের প্রকল্পের সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পরিবেশবিদ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকগণ। অর্থনৈতিক সম্ভাবনাঃ নগর উন্নয়ন সমৃদ্ধ হবে। ব্যয় ও সময় সাশ্রয়ী গণযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।

ফাস্ট ট্র্যাক প্রকল্পে অর্থায়ন

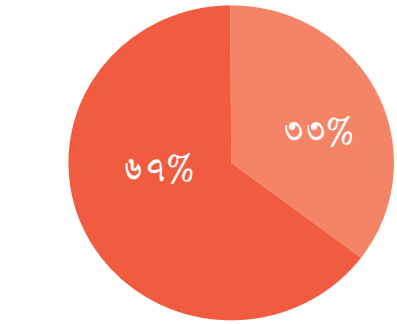

মেগা প্রকল্পের ব্যয় ও অর্থের উৎস

বৈদেশিক মুদ্রা ও নিজস্ব অর্থায়ন। মেগা প্রকল্পে বিনিয়োগ বাড়াতে প্রথমেই জোর দেয়া হয়েছে রাজস্ব আহরণের পরিমান বৃদ্ধির ওপর। বর্তমানের রাজস্ব আহরণ জিডিপি'র ৯.৬ শতাংশ হতে বাড়িয়ে ১৬.১ শতাংশে উন্নীত করা হবে। এছাড়া মেগা প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করে এসব প্রকল্পে বাজেট কমিয়ে বা স্থগিত করে মেগা প্রকল্পে অর্থ স্থানান্তরের সুপারিশ করার পাশাপাশি আরও বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

প্রাণ-প্রকৃতির সুরক্ষার প্রশ্ন

বৃহৎ অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্প ভূমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে স্থানীয় মানুষকে তাদের জীবন-জীবিকা থেকে উচ্ছেদ করছে, উচ্ছেদ করছে তাদের আদি বসতভিটা থেকে। এক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ, পুণর্বাসন, বিকল্প জীবন-জীবিকার ব্যবস্থার নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন মানবাধিকার কর্মী ও নাগরিক সমাজ। এছাড়া মেগা প্রকল্পগুলোর নির্মাণকালীন ও পরবর্তীকালে পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়টি বারবার আলোচিত হচ্ছে। পরিবেশবিদরা প্রাণ-প্রকৃতির সুরক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে সামনে আনছেন।

এই প্রেক্ষিতে কতগুলো প্রশ্ন সামনে আসে-

- মেগা ভৌত অবকাঠামো প্রকল্পে বিশাল বিনিয়োগের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা?
- সুষম বিনিয়োগ ও অগ্রাধিকারমূলক খাতসমূহ অগ্রাধিকার পাচ্ছে কিনা?
- বিনিয়োগ ভারসাম্য রক্ষা হচ্ছে কিনা?
- বৃহৎ অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পে ভ্যালু ফর মানি বিবেচনায় রাখা হচ্ছে কিনা?

- বৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্পের অভিঘাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার ও পরিবেশের সুরক্ষা হচ্ছে কিনা?
- সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য কি ধরণের সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে?

সুপারিশ

- ভূমি ও প্রকৃতিক সম্পদের ওপর মানুষের অধিকার সুরক্ষা করা;
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যবহৃত ভূমির ওপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও পরিবেশগত অধিকার ও স্বার্থ সুরক্ষা করা;
- দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা, পরিবেশ-প্রতিবেশ ও জনগণের জীবন-জীবিকার সুরক্ষা বিবেচনায় রেখে পূর্ব-প্রস্তুতি গ্রহণ করা;
- মানুষের জীবন-জীবিকা ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার মাধ্যমে টেকসই ও স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিৎ করা;
- বৃহৎ অবকাঠামো প্রকল্পে বিশাল বিনিয়োগের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ করা;
- জনস্বার্থ সংশিষ্ট প্রকল্পে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে মেগা প্রকল্প গ্রহণ করা;
- অগ্রাধিকারমূলক খাতসমূহ অগ্রাধিকার দিয়ে বিনিয়োগে সুসমতা ও বাজেট ভারসাম্য রক্ষা করা;
- বাজেট বাস্তবায়নকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে আন্তঃযোগাযোগ তৈরি করা যাতে করে প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করা যায়;
- প্রতিটি বৃহৎ প্রকল্পের ভ্যালু ফর মানি বিশ্লেষণ করে তা জনগণের সামনে তুলে ধরা;
- সরকারের সকল পর্যায়ের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা;
- বেসরকারি ও বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর করের পরিমান বাড়ানো;
- বৃহৎ প্রকল্প ও জনজীবনে তার প্রভাব বিষয়ে গবেষনার জন্য বাজেট রাখা;
- স্থানীয় জ্ঞানভিত্তিক বিকল্প উন্নয়ন কাঠামোর দিকে নজর দেয়া;
- বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, ভৌগলিক ও পরিবেশগত বাস্তবতা বিচেনায় রেখে প্রকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ করা;
- প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী ও পরিবেশ রক্ষায় সুনির্দিষ্ট জন-সুরক্ষা নীতিমালা তৈরি করা। যাতে ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও পূণর্বাসন নিশ্চিৎ হয় এবং জীববৈচিত্র ও পরিবেশ সুরক্ষিত থাকে;

তথ্যসূত্র

১. Brookes, Naomi J.; Locatelli, Giorgio (২০১৫-১০-০১)
২. বাজেট বক্তৃতা ২০১৮-১৯, ২০১৭-১৮, ২০১৬-১৭, পিডিএফ
৩. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১৮-১৯, ২০১৭-১৮, ২০১৬-১৭, ২০১৫-১৬
৪. সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০
৫. কাঠামো রূপান্তরে বৃহৎ প্রকল্পঃ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারে নতুন মাত্রা, পিডিএফ
৬. আইএমইডি
৭. প্রথম আলো, ২ এপ্রিল, ২০১৯ (অনলাইন থেকে সংগৃহিত ২৫ এপ্রিল, ২০১৯)
৮. সামাজিক ও পরিবেশ সুরক্ষা নীতি: জন প্রস্তাবনা

সহ-আয়োজক

Access Bangladesh Foundation

BDERM Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movement
বাংলাদেশ দলিত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠী অধিকার আন্দোলন

BILS

FOR the WOMEN BY the WOMEN Forum
ফর দি উইমেন বাই দি উইমেন ফোরাম

গভার্নেন্স কোয়ালিশন
GOVERNANCE COALITION

KAPAEENG Foundation

কর্মজীবী নারী
KARMOJIBI NARI

KHANI খানি
FOOD SECURITY NETWORK
BANGLADESH

LIFD

নাগরিক উদ্যোগ
NAGORIK UDDYOG
CITIZEN'S INITIATIVE

PEOPLE'S HEALTH MOVEMENT

এসপিইডি

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

UNICEF BANGLADESH

ওয়েভ ফাউন্ডেশন
WAVE FOUNDATION

তারুণ্যের বাজেট আন্দোলন